বাংলাপিডিএফ. নেট

শিশুর বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি
কীভাবে ধারালো করা যাবে

ডা. মোহিত কামাল

AKAS SUVOM

শিশুর বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি

কীভাবে ধারোলো করা যাবে

শিশুর বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি

কীভাবে ধারোলো করা যাবে

ডাঃ মোহিত কামাল

বিদ্যা প্রকাশ

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
পঞ্চম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬
স্বত্ব
রিশাদ, স্বচ্ছ ও মিলি
প্রচ্ছদ
এম. শফিক রবিন
বর্ণবিন্যাস
জীবন কম্পিউটারস
৩৮/২খ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
দাম
সত্তর টাকা
ISBN 984-422-033-9

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শু
ভ
ম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

উৎসর্গ

আমার মা, মরহুমা মাছুদা খাতুন
আমার বাবা, মরহুম আসাদুল হক

শিশুর বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি

ডাঃ মোহিত কামাল

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

গোলাম মাওলা আকাশ

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট

(fb.com/groups/Banglapdf.net)

বইপোকাদের আড্ডাখানা

(fb.com/groups/boiipoka)

এর সৌজন্যে নির্মিত

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

ভূমিকা

স্বাস্থ্য ও মন-মানসিকতা বিষয় নিয়ে গল্প লিখতে বরাবর আমার আগ্রহ বেশি। গল্পের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে উপস্থাপনার নতুন মাত্রা গত ক'বছর থেকে শুরু করেছি। যা এদেশের জাতীয় পত্রিকাগুলোয় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।

এমনি এক মুহূর্তে প্রকাশক মজিবর রহমান খোকা **'বুদ্ধিমত্তা ও স্মরণশক্তি'** বিষয়ক শিশুদের একটি বই প্রকাশে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো বাছাই করে গল্পসহ তাঁর কাছে জমা দেওয়ায় প্রথমে তিনি শুধুমাত্র প্রবন্ধগুলো ছাপতে চাইলেন। আমি তাঁকে বুঝালাম গল্পগুলো নিছক গল্প নয়। এর ভেতরে রয়েছে তথ্য ভিত্তি। গল্পের সংলাপ এবং প্রেক্ষাপট নির্মাণের মধ্য দিয়েই বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। সব শেষে রয়েছে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। তিনি বুঝলেন গল্প ও বিজ্ঞানের যৌথমিলনের এটি একটি নতুন ধারা।

আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ভেতররেই বুদ্ধিমত্তা বিকাশের পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা লুকিয়ে থাকে। আমি সেই বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। সমাধানও দিয়েছি গল্পের ভেতরে। বুদ্ধিমত্তা ও স্মরণশক্তি বিষয়ক অনুসঙ্গগুলো ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এমন কি বুকের দুধের সাথে বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক দেখাতে গিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

জীবনের এসব অনুসঙ্গগুলো অনুধাবন করে শিশুকে পরিচালনার দায়িত্ব মা-বাবাকেই নিতে হবে। বিশেষ করে আধুনিক মা'দের বিষয়গুলো জানা অতীব প্রয়োজন।

একজন গুণী মা-ই সব জেনে শুনে প্রিয় সন্তানের বুদ্ধিদীপ্ত ভবিষ্যত নির্মাণের পথটি সহজতর করে দিতে পারেন।

— ডাঃ মোহিত কামাল

আপনার শিশু ঃ কীভাবে বড় হচ্ছে, কীভাবে ধারালো করা যাবে বুদ্ধিমত্তা

গর্ভাবস্থায় শিশুটি ছিল নিরাপদ আশ্রয়ে, শান্তির জগতে।

এ জগতে মায়ের রক্ত থেকে পুষ্টি এবং অক্সিজেন নিয়ে তিলে তিলে সে বেড়ে উঠেছে সঙ্গোপনে।

একদিন শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলো, নিজের জগতে প্রবেশ করলো, আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে টেনে নিলো পৃথিবীর জটিল উপাদান, বায়ু। ভিন্ন জগতে সে এখন আলাদা একটি প্রাণ। একক সত্ত্বার স্পন্দন তার বুকে। খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে শিশুটিকে।

সে চিৎকার শুরু করলো, কান্না জুড়ে দিলো, তার দাবী এবং অধিকারের কথা জানিয়ে দিলো।

মূলত কঠিন পৃথিবীর ছায়াতলে এককভাবে শিশুটি অসহায়। সে কেবলই কাঁদে না, ঘুমোয় এবং জাগ্রত হয় নিয়ম মাফিক।

নবজাতকটি অসহায় হলেও হাত পা ছুঁড়তে পারে, মাথা নাড়াতে পারে, শরীর সম্পূর্ণ টানটান করে শুয়ে পড়তে পারে, হাই তুলতে পারে, হাঁচিকাশি দিতে পারে।

চারপাশের জগতের অনেক তথ্যও শিশুটি পঞ্চেন্দ্রীয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে– দেখা, শোনা, স্বাদ, স্পর্শ ও গন্ধের সাহায্যে পেয়ে যায় তথ্যসমূহ।

শিশুটি স্নায়ুর ওপর উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ইচ্ছা নিরপেক্ষ কিছু ক্রিয়াকলাপও প্রদর্শন করে থাকে। এ সব গতি প্রকৃতি, ক্রিয়া-বিক্রিয়া জন্মসূত্রেই প্রাপ্ত এবং কোনো রকম পূর্ব সংকেত ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে যায়। এ স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াগুলোকে বলে প্রতিক্ষেপণ ক্রিয়া (Reflex action)।

প্রতিটি মা-বাবার এ ব্যাপারে সাধারণ কিছু ধারণা থাকা উচিত। তাই এখানে সে বিষয়ে সামান্যই আলোচনা করা হলো ঃ

১। ঢোক গেলা এবং চোষা (Swallowing & Sucking reflexes)। কোনো কিছু মুখে দেওয়ার সাথে সাথে শিশুটি চোষা শুরু করে এবং গেলার চেষ্টা করে।

২। গালে আলতো করে আঙুল ছোঁয়ানোর সাথে সাথে শিশুটি মাথা বাঁকিয়ে স্তন বোঁটা খোঁজা শুরু করে (Rooting reflex)।

৩। যে কোনো জিনিস হাতে লাগা মাত্রই নবজাতকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে (Grasp reflex)।

৪। যখন লম্বালম্বি ভাবে মাথা ওপরের দিকে রেখে শিশুটিকে উত্তোলিত অবস্থায় ঝুলিয়ে ধরা হয়, পা শক্ত সমতলে ছোঁয়ামাত্রই সে হাঁটার ভঙ্গিমায় পা চালাতে শুরু করবে (Walking reflex)।

৫। হঠাৎ তীক্ষ্ণ শব্দ পেলে কিংবা প্রজ্জ্বলিত আলো মুখে এসে পড়লে শিশুটি আচমকা ভয়ে চমকে ওঠে, কনুই ভাঁজ করে শরীরের সাথে সেঁটে ধরে, কান্না জুড়ে দেয় (Starle reflex)।

৬। যে কোনো ধরনের হঠাৎ সৃষ্ট মুভমেন্ট শিশুটির ঘাড়ে এমনভাবে প্রভাব ফেলে যে, সে মনে করবে ওপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে। ফলে দুই বাহু পেছনের দিকে ছুঁড়ে দেয়, হাত খুলে প্রসারিত করে। তারপর বাহুটি আবার একত্র করে, যেন শক্ত করে কিছু একটা আঁকড়ে ধরছে (Moro reflex)।

এ ধরনের ক্রিয়াগুলোর মধ্যে চোষা এবং ঢোক গেলা শিশুর বেঁচে থাকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক মা-ই শিশুর এ জাতীয় আচরণগুলো অস্বাভাবিক মনে করেন, দুশ্চিন্তায় ভোগেন। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। এগুলো স্বাভাবিক আচরণ। এই সত্যটিই মনে রাখতে হবে।

এই প্রতিক্ষেপণ প্রক্রিয়াগুলো সাধারণত তিনমাস পর আর দেখা যায় না।

অনুভূতি সমূহ

দেখা ঃ নবজাতক শিশুটি চোখে দেখতে পায়।

আশ্চর্য হলেন ?

না, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এটিই সত্যি।

শিশুটির চোখ ২০–২৫ সেমি. এলাকার মধ্যস্থিত বস্তুর আলোর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে পারে। ফলে মা যখন শিশুটিকে কোলে নেন বা দুধ খাওয়ান, সে তখন মায়ের মুখ দেখে, চিনে নেয় ধীরে ধীরে।

উজ্জ্বলতার প্রতিও তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। খোলা জানালা দিয়ে আলোর প্রবেশ পথের দিকে সে তাকিয়ে থাকে, কিংবা অতি উজ্জ্বল আলো হঠাৎ চোখে এসে পড়লে চোখ কুঁচকে নেয়।

শোনা ঃ একটি নবজাতক শিশু শব্দ শুনতে পারে। চোখের পাতা কুঁচকিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে, প্রশ্বাস টেনে শব্দের প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

শিশুটি হয়তো খাচ্ছে, হঠাৎ বিকট শব্দে খাওয়া বন্ধ করে কতোক্ষণ থমকে থাকবে।

শিশুটি কান্না করছে। এ সময় কথা বলার শব্দ কানে আসার সাথে সাথেই হয়তো সে কান্না বন্ধ করে দেবে, কণ্ঠ শোনার দিকে মনোনিবেশ করবে। ক্রমান্বয়ে মায়ের মুখের উচ্চারিত শব্দ সে শুনতে শুনতে চিনে ফেলে।

স্বাদ এবং গন্ধ ঃ শিশুরা স্বাদ এবং গন্ধের ব্যাপারে বেশ অনুভূতিশীল। বিরক্তিপূর্ণ কদর্য গন্ধ পেলে মাথা ঝাঁকিয়ে স্থান ত্যাগ করার জন্য সে অধির হয়ে পড়বে। মায়ের শরীরের সংস্পর্শে থাকলে তারা দুধের গন্ধ পায়। মুখটি স্তনের বোঁটায় স্থাপন করার জন্য আঁকুপাঁকু করতে থাকে।

স্পর্শ ঃ নবজাতক শিশুটি স্পর্শেও আন্দোলিত হয়, ব্যথা পেলে কিংবা কোনো অবস্থানচ্যুতি হলেও তারা বুঝতে পারে, গোসলের পানি অতিরিক্ত ঠান্ডা কিংবা গরম হলেও তারা কান্না শুরু করবে।

শিশুর ঘুম

অধিকাংশ নবজাতক শিশুই ঘুমিয়ে বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেয়। খাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কেবল জাগে।

ঘুমের পরিমাণগত তারতম্য লক্ষণীয়।

শিশুতে শিশুতে কিংবা দিনে দিনে ঘুমের পরিমাণগত হেরফের হয়।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনেক শিশুই আঠারো থেকে বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়।

একবারে একটি শিশু কতক্ষণ ঘুমোবে, নির্দিষ্ট করে বলা প্রায় অসম্ভব। সম্ভবত একটি শিশু গড়ে একনাগাড়ে এক কিংবা দু'ঘণ্টা ঘুমোনোর পরও তাদের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে।

প্রথম দিকে সদ্যজাত শিশুটির কোনো রুটিন মাফিক নিয়মনীতি থাকে না। ক্রমান্বয়ে যখন চারপাশের দিনের আলো, চলাফেরা সংক্রান্ত আওয়াজ শুনতে পায়, ঘুম একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের ভেতর চলে আসে। দিনের চেয়ে রাতে বেশি ঘুমোতে পারে শিশু। তিনমাস বয়সের একটি শিশু একনাগাড়ে পুরো একরাত ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে।

ঘুমের পদ্ধতি ঃ বাড়ন্ত শিশুকে একপাশে ফিরিয়ে শোয়ানোর অভ্যাস করা উচিত, যেন ঘুমিয়ে পড়ার পর নিশ্চিন্তে থাকতে পারে, যেন গড়িয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কখনোই শিশুটি যেন বুকের ওপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে না শোয়, খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটি মাকে।

শিশুর প্রয়োজন

নবজাতকের বেঁচে থাকার জন্য, বেড়ে ওঠার জন্য এবং শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সাধনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া খুবই জরুরী।

এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো শিশুটির আবেগপূর্ণ অনুভূতির নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উত্তরণ এবং বুদ্ধিমত্তার বিকাশ সাধন করে থাকে।

উষ্ণতা ঃ মাতৃজঠরে থাকা অবস্থায় শিশুটি সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বাড়তে থাকে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তবুও মায়ের ওপরই নির্ভরশীল থাকে। মা-ই তাকে পরিবেশের অতিরিক্ত উষ্ণতা বা ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে।

পূর্ণ গর্ভাবস্থাকালীন সময় পেরিয়ে (চল্লিশ সপ্তাহ) যে শিশুটির জন্ম হয়, প্রকৃতিগত ভাবেই তাদের শরীরে উষ্ণতা রক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে। ওই সব শিশুর ত্বকের নিচে থাকে একটি চর্বির আবরণী (Fatty Layer)। এই আবরণীটি শিশুর ভেতরের উষ্ণতা রক্ষা করে, প্রয়োজনে শরীরে অতিরিক্ত তাপ সরবরাহ করে। তারপরও বলা যায়, বেশি সময় যদি একটি শিশু ঠাণ্ডার স্পর্শে থাকে, অতিরিক্ত তাপ হারিয়ে সে ঠান্ডায় আক্রান্ত হতে পারে, ভয়াবহ পরিণতি আসতে বাধ্য। সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে মাকে।

- ❑ খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়।
- ❑ অসুস্থতা ও জখম হওয়া থেকে শিশুকে রক্ষা করা।
- ❑ আলো ও বিশুদ্ধ বাতাস।
- ❑ শিশুটির দৈনন্দিন চাঞ্চল্যতা এবং বিশ্রাম।

❑ আদর, সোহাগ এবং আরামদায়ক পরিচর্যা।

❑ ধারাবাহিক লালন-পালনের ব্যবস্থা করা, ত্রুটিহীন যত্নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

❑ শিশুর মনে বিশ্বাস স্থাপন করা যে সে নিরাপদ আছে।

❑ পারদর্শিতা বাড়ানো এবং অভ্যাস গঠনের জন্য শিশুটিকে ট্রেনিং দেওয়া।

❑ খেলার মাধ্যমে নতুন কিছু শেখার ব্যাপারে শিশুটিকে উৎসাহিত করা।

শিশুর সামাজিক বিকাশ

নবজাতকের শারীরিক বৃদ্ধি এবং বিকাশের সাথে সাথে সামাজিক এবং মানসিক স্তরের উন্নতির দিকেও সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

আমরা কেবল চোখের সামনে শিশুটির বেড়ে ওঠা নিয়ে অস্থির থাকি, মানসিক এবং আবেগপূর্ণ অনুভূতির সঠিক পরিচর্যার দিকে নজর দেই না, নজর দেই না পারিপার্শ্বিকতার দিকে। একজন গুণী এবং শিক্ষিত মা-ই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে, সঠিকভাবে শিশুটির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

এ ব্যাপারে কেবল মায়ের ভূমিকাই মূখ্য নয়। বাবাকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও একই ভূমিকা পালন করা উচিত।

কিছু কিছু আদব-কায়দায় পারদর্শীতায় এবং কৌশলে শিশুটিকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। তবেই সে ক্রমান্বয়ে পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, চারপাশের সকলের সাথে সহজে মিশতে পারবে, পারবে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় নিজে নিজে শিখে নিতে।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের কৌলিণ্য অনুযায়ী খাওয়া-পরা, পরিচ্ছন্নতা, সৌজন্যতা বিনিময়, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি ভেদে পার্থক্য আছে। যার যার অবস্থান অনুযায়ী পরিবেশগত উত্তরণ এবং বিকাশের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

সামাজিক বিকাশের স্তর

শিশুরা জন্মগতভাবেই সঙ্গী চায়। একাকী হলেই কাঁদে, কেউ এসে কোলে নিলে কান্না থেমে যায়, স্বস্তি পায়।

❑ **অন্যের সান্নিধ্যে শিশুটির প্রতিক্রিয়া ঃ**

২ সপ্তাহ ঃ মা যখন খাওয়াতে ব্যস্ত থাকে, টুকটুক করে কথা বলে, শিশুটি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, সহজেই মাকে চিনে ফেলে।

৪–৬ সপ্তাহ ঃ এ সময় শিশুটি হাসতে শুরু করে। যখন কেউ তার দিকে তাকাবে— সে আনন্দ পাবে, হাসবে।

৩ মাস ঃ যদি বয়স্ক কেউ শিশুটির সাথে কথা বলতে চায় অথবা কোনো কিছুর শব্দ করে, তবে সেও প্রতিক্রিয়া জানাবে।

৬ মাস ঃ এ সময় শিশুটি সহজেই অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কৌশল শিখে যায়। যেমন— কাশি দেয়, শব্দের অনুকরণ করার চেষ্টা করে, কথা বলার চেষ্টা করে, খেলনা ধরতে চায়, স্বল্প অবলম্বনে বসতে পারে।

সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারে যে, সে কী চায়।

❑ ক্রমে ক্রমে শিশুটি বুঝতে শেখে যে সে পরিবারের একজন ঃ

৯ মাস ঃ চারপাশের চেনাজানা ব্যক্তি থেকে অপরিচিত যে কাউকে সে সনাক্ত করতে পারে। অপরিচিতজনদের সামনে অস্বস্তিবোধ করে, অস্বস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পরিচিতজনদের কাছে সে সহানুভূতি পেতে চায়।

❑ পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে শিশুটি সহযোগিতা করতে শেখে ঃ

১২ মাস ঃ সাধারণ আদেশ-নিষেধ সে বুঝতে শেখে এবং পালন করার চেষ্টা করে।

১৫ মাস ঃ ঘরে এবং বাগানে সে বয়স্কদের সাথে মিশে যেতে পারে, সহযোগিতা করার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় তার ভেতর।

২ বৎসর ঃ এ সময় শিশুটি অন্য শিশুদের আশে-পাশে খেলতে পছন্দ করে, কিন্তু তাদের সাথে খেলার চেষ্টা করে না। সে নিজ অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। অন্য শিশুটি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়লে তার ভেতর সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত হয়।

৩ বৎসর ঃ অন্য শিশুদের সাথে সে খেলাধূলা করে, সহযোগিতা আদান-প্রদানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

৪ বৎসর ঃ খেলার জন্য সে সঙ্গী খোঁজে, তবে কখনো তার আচরণ থাকবে সহযোগিতাপূর্ণ, কখনো থাকবে বিক্ষুব্ধ।

৫–৭ বৎসর ঃ সাথীদের সে সহযোগিতা করে, পরিচ্ছন্ন খেলার নিয়মনীতি বুঝতে শেখে এবং মেনে চলার চেষ্টা করে।

শিশুর একাকীত্ব

সামাজিকভাবে মেশার জন্য যেসব শিশুর সঙ্গীর অভাব থাকে কিংবা আদৌ থাকে না— তাদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক বিকাশের হার হয় খুবই নিম্নগামী বুদ্ধির ধারও বাড়তে পারে না একাকীত্বের কারণে।

একাকীত্ব এভাবেই শিশুর ধ্বংস ডেকে আনে।

আবেগপূর্ণ অনুভূতির বিকাশ

ভয়, উত্তেজনা, সোহাগ, আনন্দ-বেদনা, ঈর্ষা, ক্রোধ, লজ্জা এবং হতাশা এসব আবেগীয় অনুভূতিতে বাড়ন্ত শিশুরা বেশিমাত্রায় জড়িয়ে যায়।

জন্মগত প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের প্রভাবের মাধ্যমে আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়ে বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়েই একটি শিশুর আবেগপূর্ণ অনুভূতির বিকাশ ঘটে থাকে।

জন্মগত প্রবৃত্তি ঃ পিতামাতা থেকে প্রাপ্ত 'জিন' (Genes)-এর ওপর এটি নির্ভরশীল। কিছু কিছু শিশু প্রবৃত্তিগতভাবেই উত্তেজিত স্বভাবের, কিছু কিছু একদম শান্ত। কেউ কেউ অতিমাত্রায় লজ্জাপ্রবণ, কারো কারো ভেতর লজ্জার বালাই নেই।

স্বাস্থ্য ঃ শিশুর স্বাস্থ্যগত অবস্থার সাথে আবেগ সরাসরি সম্পর্কিত।

সুস্থ শিশুর মন-মানসিকতা থাকে এক রকম, অসুস্থ শিশুর থাকে অন্য রকম। দীর্ঘদিন অসুস্থতায় ভুগলে শিশুটির মানসিক বিকাশ এলোমেলো হয়ে যায়।

পরিবেশ ঃ মানসিক বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা অত্যধিক। শিশুর স্কুল, বন্ধুদের বৈশিষ্ট্য, খেলাপ্রাঙ্গণ প্রভৃতি শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য ভেতরে ভেতরে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

ঘর ঃ ঘরের পরিবেশ একটি শিশুর আবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য খুবই প্রয়োজন। মা-বাবার শান্তিময় দাম্পত্য জীবন, পরিবারের অন্যান্য সদস্য/সদস্যাদের ভালো আচরণ শিশুটিকে মানসিক দিক থেকে শক্তিমান করে তোলে।

বখে যাওয়া শিশুটিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

দোষ দিতে হবে নিজেকে, কি ধরনের পরিবেশে শিশুটি বেড়ে উঠছে সেটিই মূল্যায়ন করতে হবে গুরুত্বের সাথে।

ভালোবাসা ঃ স্নেহ-মমতা এবং ভালোবাসার বন্ধনই একটি শিশুর জন্য অতীব প্রয়োজন। এ কথা আমরা সবাই জানি। তারপরও ভুল হয়, পরিবার ভেদে শিশু তার এই মৌলিক প্রাপ্য থেকে অনেক সময় বঞ্চিত হয়।

লজ্জা ঃ লজ্জা এবং সংকোচ অনেক সময় শিশুটিকে সংকোচিত করে রাখে। পরিবারে নতুন কেউ এলে এই সংকোচ আরো বেশি চেপে বসে, কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে।

কৌশলে শিশুটির সংকোচ দূর করতে হবে সহানুভূতির সাথে।

সংকোচ কাটিয়ে ওঠার ব্যর্থতা শিশুটিকে ক্রমান্বয়ে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলতে পারে।

কষ্টকর পরিস্থিতিতে শিশুটির আবেগঘন প্রতিক্রিয়া

বিপদে পড়লে, কিংবা চাপের মুখে শিশুদের প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক।

যে সব কারণগুলো শিশুর ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে সেগুলো হচ্ছে ঃ

১। শিশু নির্যাতন।

২। ঘনিষ্ট কারো মৃত্যু।

৩। পারিবারিক ভাঙ্গন। বিশেষত মা-বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ।

৪। বাসা বদলানো।

৫। পরিবারে অন্য একটি শিশুর আগমন, ইত্যাদি।

যেহেতু পুরোপুরি আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা শিশুরা আয়ত্তে আনতে পারে না, তাই নানাভাবে খারাপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে ঃ

১। প্রত্যাবৃত্তি; পশ্চাদগতি (Regression)

২। ঈর্ষা।

৩। দুঃস্বপ্ন।

৪। বিছানা ভিজানা।

৫। কথা বন্ধ করে দেওয়া (Elective mute)।

৬। ক্রোধান্বিত হওয়া।

এ ধরনের চাপ থেকে শিশুটিকে মুক্ত করা যায়, কিংবা হালকা করা যায়। এ সময় শিশুটির প্রতি মা-বাবার সতর্ক দৃষ্টির অতীব প্রয়োজন রয়েছে, আদর যত্নে ভুলিয়ে তার মনকে রাখতে হবে প্রফুল্ল এবং প্রাণবন্ত।

শিশুর বুদ্ধিমত্তার বিকাশ

মন ও বোধের বিকাশই বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের মূল স্তম্ভ।

মন হচ্ছে ব্রেণেরই অংশ, যা চিন্তা চেতনার সাথে সম্পৃক্ত। এটির মাধ্যমেই আমরা কোনো কিছু সনাক্ত করতে পারি, জানতে এবং বুঝতে পারি জিনিসটি কি। যে কোনো ঘটনা প্রবাহের পেছনের অন্তর্নিহিত কারণও উদ্‌ঘাটন করতে পারি।

জন্মের পরপরই শিশুটির মনটিও সক্রিয় হয়। শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে তার মনও বিকশিত হতে শুরু করে। কারণ তখন সে—

১। মানুষ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে।

২। বস্তু সম্পর্কে শেখে।

৩। নতুন কৌশল আয়ত্তে আনে। দক্ষতা বাড়ে।

৪। পরিবেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত করে।

৫। অনেক তথ্য, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লাভ করে।

মনের বিকাশের সাথে সাথে শিশুটি ক্রমশ ধীশক্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠে এ সময় কতটুকু বুদ্ধিমত্তার অধিকারী হবে। তা নির্ভর করে দুটো প্রধান বিষয়ের ওপর ঃ

জিন (Genes) ঃ জিন প্রকৃতি প্রদত্ত ধীশক্তির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

পরিবেশ ঃ শিশুটি কীভাবে স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে নিজেকে ধাবিত করছে, কীভাবে ধীশক্তির বিকাশ সাধিত হবে, মূলত এসব কিছুই নির্ভর করছে তার চারপাশের পরিবেশের ওপর।

পুরো শৈশবকালে জিন এবং পরিবেশের ক্রমাগত পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ওপরই মনের নানা ধারার উত্তরণ ঘটে। তাই কেবল জন্মগতভাবে প্রাপ্ত জিনের ওপর নির্ভর করলে চলবে না, শিশুর বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য পরিবেশের গুরুত্বও কম নয়। ঐশ্বর্যময় পরিবেশেই নিশ্চিত করতে পারে শিশুটির জন্য বুদ্ধিদীপ্ত ভবিষ্যৎ।

ধীশক্তি বিকাশে কীভাবে শিশুকে উৎসাহিত করা যায় ?

প্রথম বৎসরে শিশুটির মনের বিকাশের জন্য নানাভাবে সহায়তা করা যায়। যদি মা-বাবা–

১। শিশুটির সাথে কথা বিনিময় করার চেষ্টা করেন।

২। শিশুটির সাথে খেলাধুলায় শরিক হন।

৩। এমন একটি স্থানে শিশুকে রাখেন যার পাশে কী ঘটছে না ঘটছে তিনি দেখতে পান। এতে শিশুর আস্থা বাড়ে।

৪। খেলনা এবং কৌতূহলোদ্দীপক কোনো কিছু শিশুকে দেওয়া উচিত যাতে শিশু সেটি নেড়েচেড়ে দেখতে পারে, খুলতে পারে।

৫। তাকে নতুন কৌশল শিখতে দেওয়া উচিত। যেমন, নিজ হাতে খেতে দেওয়া।

প্রথম বৎসরের পর মনের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে যদি শিশুকে নিচের কাজগুলোর প্রতি উৎসাহিত করা হয় ঃ

১। কথা বলতে দেওয়া।

২। নতুন কৌশল, যেমন নিজের পোষাক পরতে দেওয়া, ছবি আঁকার চর্চায় শিশুকে নিয়োজিত রাখা। ইচ্ছের বিরুদ্ধে নয়, বরং ইচ্ছেটি জাগিয়ে রাখার কৌশল নির্ধারণ করা।

৩। জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা।

৪। নতুন নতুন স্থানে শিশুকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

৫। এমন খেলনা সরবরাহ করা যা তার চিন্তা শক্তিকে স্পন্দিত করে।

৬। সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহ দেওয়া।

৭। পড়তে উৎসাহিত করে তোলা।

বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে পরিবেশের ভূমিকা

চারপাশের নানা বিষয় এবং উদ্দীপক বস্তু থেকে তথ্য আহরণ করে নবজাতকটি ধীরে ধীরে পরিবেশের ব্যাপারে সচেতন হতে থাকে। সাধারণত শিশুরা নতুন কিছুর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, ভিন্ন বস্তুর সাথে পরিচিত হতে মেধার অদৃশ্য সুতোটিকে গভীরভাবে জড়াতে চায়। এই প্রবৃত্তি থেকে বুদ্ধিবিকাশের সাবলীর ধারাটির সূচনা হয়। নতুন উদ্দীপক বস্তু আবিষ্কার কিংবা পরিচিত হওয়ার পথে যেন কোনোক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়— সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের।

তিন মাস পর থেকেই শিশুটি এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোটখাট বস্তু স্পর্শ করতে চায়, নাড়াচাড়া করে মুখে পুরে দিতে চেষ্টা করে। আসলে তারা বস্তুর আকার, আকৃতি, ধরন বুঝে নতুন তথ্য শেখা শুরু করে। বুঝতে পারে বস্তুটি কেমন, কী ধরনের দেখতে, কিংবা ছুঁড়ে দিলে কী ধরনের শব্দ হয় ইত্যাদি। নতুন নতুন বস্তু থেকে এভাবেই শিশুটি প্রতিনিয়ত শিখতে থাকে, মেধার ভান্ডারটি পূর্ণ করে তোলে।

যখন চলাফেরা কিংবা কথা বলতে শেখে তখন নতুন কিছু অথবা নতুন জায়গা সম্বন্ধে বারবার জানতে চাইবে, নতুন স্থানে যেতে চাইবে। আগ্রহ সৃষ্টিকারী পরিবেশের ব্যাপারে খুঁটিয়ে বারবার খুঁটিয়ে প্রশ্ন করবে। বিরক্তি প্রকাশ করা উচিত নয়। তার জানার নেশাটি তীব্র করে তোলাই শ্রেয়। তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করুন। তার বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের চাবিটি আপনার হাতে।

মনে করুন সন্তান নিয়ে 'শিশু পার্কে' গেছেন। 'উড়ন্ত যানের' সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কৌশলে 'সংখ্যা' সম্পর্কে তাকে দক্ষ করে তোলা যায়।

প্রশ্ন করুন, 'ক'টি উড়ন্ত যান আছে, বলতে পারবে ?'

সে গুণতে থাকবে। যদি গুণতে সফল হয়, তবে আবার প্রশ্ন করুন, 'ক'টি লাল রঙের ? ক'টি হলুদ কিংবা নীল রঙের ?'

অথবা মনে করুন, ফুলবাগানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গাছের ফুলগুলো গুণতে বলুন। এক, দুই, তিন থেকে দশ পর্যন্ত গোনা হলে, উল্টো দিক থেকে গুণতে বলুন– দশ নয় আট এভাবে।

পুরো ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে বলা যাবে, শিশুটি রঙ এবং সংখ্যা সম্বন্ধে পারদর্শী হয়ে উঠবে, তার মনোসংযোগ বাড়বে, শেখার প্রতি উদ্দীপনা জাগবে, মেধা হবে ক্ষুরধার, স্মৃতি হবে স্থায়ী।

এভাবে বিভিন্ন খেলাচ্ছলেও তাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়।

দেখবেন আড়াই বৎসর বয়স থেকে শিশুটি প্রশ্ন করা শুরু করেছে, 'কি' 'কে'।

তিন বৎসর বয়সে জানতে চাইবে, 'কোথায়'।

চার বৎসরে প্রশ্ন করবে, 'কেন' 'কখন' 'কীভাবে'।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে চারপাশ সম্বন্ধে তাদের জানার পরিধিও বাড়বে, বাড়তে থাকবে লাগাতার প্রশ্নের ধারা।

এক সময় এমন একটি বয়সে পৌঁছে যাবে যখন কখনো দেখেনি এমন মানুষ কিংবা জায়গা সম্বন্ধে বুঝতে পারবে। অতীতে কী ঘটেছিল, ভবিষ্যতে কী ঘটবে ইত্যকার বিষয়ে ধারণা করতে পারবে নিজস্ব বোধশক্তিও উত্তরণের কারণে।

সন্তানকে জ্ঞান এবং বোধশক্তি বাড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহী করতে চান ?

একটি বই তার হাতে তুলে দিন। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিন। ছবির বই দিলে ছবির অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিয়ে বলুন।

গল্প শোনাতে পারেন শিশুটিকে। প্রায় আমরা গল্প বলি। কিন্তু তার Attention & Concentration আছে কিনা খেয়াল করি না। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুটিকে সাচেতনভাবে সুস্থির মনোসংযোগের মাধ্যমে কিছু শেখানো গেলে, তার স্মৃতিশক্তির ভিত্ হবে মজবুত, অবশ্যই সে ব্রিলিয়ান্ট হতে বাধ্য।

অনেক সময় বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে শিশুটির মনের চাহিদা থমকে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ থাকা উচিত।

বুদ্ধি বিকাশে যা অন্তরায় সৃষ্টি করে

১। কথা বলা এবং খেলাধুলার পর্যাপ্ত সুযোগ না পাওয়া।

২। নতুন কিছু করার ব্যাপারে বাধার সম্মুখীন হওয়া বা উৎসাহ হারিয়ে ফেলা।

৩। যদি অবিরাম শিশুটির খুঁত ধরা হয়, বকাঝকা করা হয়।

৪। কানে না শোনা।

৫। ঘন ঘন অসুস্থ হওয়া।

৬। স্কুলে নিয়মিত বা প্রায় অনুপস্থিত থাকা।

আমরা সবাই চাই শিশুটি সুস্থ থাকুক, নির্বিঘ্নে বেড়ে উঠুক, চাই শিশুটি ধীশক্তি সম্পন্ন হোক।

সব চাওয়ার সফল রূপায়নের জন্য শিশুর চারপাশের প্রতি নজর রাখতে হবে বেশি।

নিত্যনৈমেত্তিক খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হয়ে আমরা পারি শিশুটিকে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ উপহার দিতে।

বুকের দুধ ঃ কীভাবে উৎপাদিত হয়, কেন কমে, কীভাবে বাড়ানো যায় শিশুর বুদ্ধিমত্তার সাথে বুকের দুধের সম্পর্ক

শিশু সুন্দরের প্রতীক, নির্মলতা ও ভালোবাসার প্রতীক। নাড়ি ছেঁড়া মমতার ধন এই শিশু।

নির্মল আধার, প্রকৃতির সবচেয়ে কোমল আবাসস্থল মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে শিশুটি প্রথম প্রশ্বাসে টেনে নেয় পৃথিবীর জটিল উপাদান বায়ু। চিৎকার জুড়ে দেয় সে, আশ্রয় চায়, খাদ্য চায়, পানীয় চায়, চায় মাতৃত্বের উষ্ণপরশ, বন্ধন।

মাতৃদুগ্ধই নাড়ি ছেঁড়া বন্ধনটিকে পুনঃস্থাপন করে, শিশুটিকে দেয় সর্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক পানীয়, খাদ্য।

কীভাবে উৎপাদিত হয় মাতৃদুগ্ধ ?

প্রতিটি শিক্ষিত মায়ের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকার প্রয়োজন আছে। জানতে হলে প্রথমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু জটিল শব্দের সাথে নিজেকে একাত্ম করতে হবে, ধৈর্য হারালে চলবে না।

স্তনের গঠন সম্বন্ধে ধারণা খোলামেলা না হলে দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং প্রবাহ বোঝা কষ্টকর হবে।

তাই আসুন, প্রথমে বোঝার চেষ্টা করি স্তনের কাঠামোটি।

স্তনের গঠন

দশ-বারো বছর পূর্বে মেয়েদের স্তনের গঠন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, থাকে অপরিপুষ্ট। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে কাঠামোগত পূর্ণতা বাড়তে থাকে, গর্ভাবস্থায় স্তন দুগ্ধোৎপাদনের জন্য গঠনের দিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

স্তন প্রধাণত তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত ঃ

১। গ্রন্থিময় কোষকলা (Paranchyma)।

২। মূল বা ভিত্তি তন্তু (Stroma)।

৩। ত্বক।

গ্রন্থিময় কোষকলা

প্রতিটি গ্রন্থিতে রয়েছে পনেরো থেকে বিশটি অংশ (Lobes)।

প্রতিটি অংশ (Lobule) একগুচ্ছ বায়ুকোষ (Alveoli) নিয়ে গঠিত। এছাড়া দুগ্ধগ্রন্থির গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হচ্ছে অজস্র নালীর (Duct) বিন্যাস।

বায়ুকোষে দুধ উৎপাদিত হয়, উৎপাদিত দুধ নালী বেয়ে অগ্রসর হয়। গ্রন্থিনালীগুলো স্তনের বোঁটার দিকে সন্নিবেশিত হয়, বোঁটায় উন্মুক্ত হয়। প্রায় পনেরো থেকে বিশটি নালী দুধের প্রবাহ চালিয়ে থাকে।

নালীগুলো বোঁটায় উন্মোচিত হওয়ার পূর্বে স্তনের সম্মুখের কালো অংশের (Areola) নিচে স্ফীত হয়।

এই স্ফীত আধারকে বলে সাইনাস (Sinus)। এখানে দুধ এসে জমা হয়।

যদি সাইনাসগুলো দুধে অত্যধিক পূর্ণ থাকে তবে স্তনের বোঁটা শক্ত হয়ে ফুলে ওঠে, স্তনের সমতলে মিশে যায়। তখন শিশু এই বোঁটা মুখে পুরে চুষতে পারে না।

স্তনের সম্মুখে বোঁটার গোড়ার দিকে যে কালো অংশটি (Areola) রয়েছে, সেটির গুরুত্ব অনেক।

কালো অংশটির বাইরের কিনারা বরাবর রয়েছে প্রচুর ব্যতিক্রমধর্মী সেবাসিয়াস গ্রন্থি। গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালীন সময়ে এই গ্রন্থিগুলো ফুলে ঢিপে উঁচু হয়ে থাকে (Montgomery tubercle)। এসব গ্রন্থি থেকে তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয়; বোঁটা এবং কালো অংশটি মসৃণ রাখে, ফাটা রোধ করে। বোঁটাটি গোলাকার এবং লম্বালম্বি মসৃণ মাংসপেশি দ্বারা গঠিত। ফলে বোঁটা দৃঢ় ও চেপ্টা থাকে, চোষার জন্য থাকে উপযোগী।

মূল বা ভিত্তি তন্তু

স্তনের কাঠামোগত অবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ

মূলত দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত ঃ

১। চর্বিময় কোষকলা (Fatty Portion) ঃ চর্বিই স্তনের বৃহদাংশ গঠন, সুডৌল আকৃতি নির্ধারণ করে।

২। আঁশ যুক্ত পেশির জট বা দৃঢ়তাদায়ক অংশ (Fibrous Portion) ঃ এটি স্তনকে সমুন্নত এবং সুরক্ষা করে। বুকের পেশির আবরণীর সাথে একীভূত হয়ে বুকের সাথে স্তনের অবস্থানকে দৃষ্টিনন্দন রাখে। স্তন্যদানের সাথে আঁশযুক্ত পেশির সরাসরি সংযোগ নেই। তাই বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ালে, স্তন ঝুলে যাবে, ধারণাটি ভ্রান্ত। দুগ্ধবতী হওয়ার কারণে গঠনে কিছুটা পরিবর্তন আসে, দুগ্ধদানের কারণে নয়। দুগ্ধ বন্ধ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

কীভাবে উৎপাদিত হয় বুকের দুধ

করোটির ভেতর ব্রেণের গোড়ার দিকে সিলাটার্সিকাতে (Sillaturcica) রয়েছে পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)। এই গ্রন্থিটি ব্রেণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) এর সাথে পিটুইটারি বৃন্ত (Pituitary Stalk) দ্বারা সংযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত।

কার্যত পিটুইটারি গ্রন্থিটি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

১। সম্মুখবর্তী পিটুইটারি গ্রন্থি (Anterior Pituitary gland), অনেক গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের পাশাপাশি মায়ের এই গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় প্রোল্যাকটিন (Prolactin) নামক একটি হরমোন। এই হরমোনটিই দুধ উৎপাদনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

২। পশ্চাৎবর্তী পিটুইটারি গ্রন্থি (Posterior Pituitary gland), এই গ্রন্থি থেকে বের হয় অক্সিটোসিন (Oxytocin) নামক আর একটি হরমোন। হরমোনটি বায়ুকোষ থেকে দুধ নির্গমনের প্রধান কাজটি করে।

গর্ভাবস্থায় পঞ্চম সপ্তাহ থেকে প্রোল্যাকটিন হরমোন নিঃসরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। প্রসবকালীন সময়ে মাত্রা থাকে সর্ব্বোচ্চ, স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি।

৩। এ সময় গর্ভফুল (Placenta) থেকে নিঃসৃত হয় হিউমেন কোরিওনিক সোমাটোম্যামোট্রফিন (Human Chorionic Somatomammotrophin) হরমোন। এটিও দুগ্ধোৎপাদনে ভূমিকা রাখে।

৪। গর্ভাবস্থায় গর্ভফুল থেকে ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরোন হরমোনের ক্ষরণও অত্যধিক বেড়ে যায়।

৫। ইস্ট্রোজেন মূলত স্তনের গ্রন্থিনালী বৃদ্ধি ও শাখা প্রশাখা বিস্তারে ভূমিকা রাখে।

প্রোজেস্টেরোন অন্যান্য হরমোনের সাথে মিলেমিশে প্রধাণত দুগ্ধগ্রন্থির প্রতিটি অংশ ও বায়ুকোষের বিকাশ এবং নিঃসরণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

৬। আবার ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরোন একত্রে এ সময় প্রোল্যাকটিনের দুগ্ধোৎপাদনে বাধা দিয়ে থাকে।

৭। কিন্তু সোমাটোম্যামোট্রফিন হরমোনের কারণেই প্রতিদিন বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর পর্যন্ত কয়েক মিলি লিটার তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়। এই তরল পদার্থটিকে বলা হয় শালদুধ (Colostrum)। প্রসবের সাথে সাথে ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরোন নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রথম দুই-তিন দিন শালদুধের মাত্রা থাকে বেশি। প্রোল্যাকটিন তখন বাধার মুখোমুখি হয় না, ফলে এককভাবে কাজ শুরু করে; দুই-তিন দিনের মধ্যেই প্রকৃত দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদিত হতে থাকে।

৮। পর্যাপ্ত দুধ উৎপাদনের জন্য মায়ের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন, যেমন ঃ গ্রোথ হরমোন (Growth Hormone), কর্টিসল (Cortisol), প্যারাথাইরয়েড হরমোন (Parathyroid Hormone) এর সঠিক মাত্রার কাজও জড়িত আছে।

এই হরমোনগুলো দুধে অ্যামাইনো এসিড (Amino aid), ফ্যাটি এসিড (Fatty acid), গ্লুকোজ ও ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে থাকে।

কীভাবে দুধ নির্গত হয়

স্তনের দুগ্ধগ্রন্থির বায়ুকোষে অনবরত দুধ উৎপাদিত হচ্ছে, কিন্তু গ্রন্থিনালীতে আসছে না সহজেই। এ কারণেই দুধ বোঁটা দিয়ে অনায়াসে ঝরে পড়ে না।

বাচ্চাকে পান করানোর জন্য অবশ্যই বায়ুকোষ থেকে দুধকে গ্রন্থিনালীতে বের করে আনতে হবে।

কীভাবে ?

দু'ভাবে কাজ হয়— স্নায়ুর প্রভাব ও অক্সিটোসিন হরমোনের ক্রিয়ার মাধ্যমেই দুধ বায়ুকোষ থেকে বেরিয়ে আসে।

১। শিশু যখন বোঁটা চোষে স্নায়ুতন্ত্রের অনুভাবক অংশ (Sensory Protion)-এর মাধ্যমে খবর পৌঁছে যায় হাইপোথ্যালাসাসে, সেখান থেকে সিগনাল যায় পিটুইটারি গ্রন্থিতে। সাথে সাথে অক্সিটোসিন হরমোন নিঃসৃত হয়। প্রোল্যাকটিন হরমোনও বের হয়।

২। অক্সিটোসিন রক্তের মাধ্যমে স্তনে চলে আসে, এসে মায়োইপিথেলিয়াল (Myoepithelial cell) কোষকে সংকুচিত করে। এই কোষগুলো বায়ুকোষ ঘিরে থাকে। সংকোচনের ফলে বায়ুকোষও সংকুচিত হয়। দুধ ভেতর থেকে দুগ্ধনালী বেয়ে চলে আসে এবং সাইনাসে জমা হয়।

৩। শিশু যখন দুধ চোষে, মূলত মাড়ি দিয়ে বোঁটার কালো অংশের তলে সাইনাসগুলোর ওপর চাপ দেয়, ফলে দুধ আসতে থাকে বোঁটায়, শিশু পেয়ে যায় জন্মের স্বাদ।

কেন দুধ কমে

প্রসবোত্তর সময়ে মায়ের মানসিক প্রশান্তির ঘাটতি হলে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে।

মা উদ্বিগ্ন থাকলে, শিশুর এটা-ওটা নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত হয়ে ক্লান্ত কিংবা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে, পারিবারিক বা দাম্পত্য জটিলতার কারণে উত্তেজিত থাকলে, হাইপোথ্যালামাস পশ্চাতবর্তী পিটুইটারি গ্রন্থিকে দমিয়ে রাখে। ফলে অক্সিটোসিন হরমোনের নিঃসরণ কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়, নিশ্চিতভাবে তখন দুধের নির্গমন কমে যাবে কিংবা বন্ধ হয়ে যাবে। বিষয়টি ভালোভাবে জানা উচিত সকল মাকে।

প্রসবের পর প্রোল্যাকটিন নিঃসরণও কমতে থাকে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হরমোনটির মাত্রা গর্ভাধাণ পূর্বাস্থার ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

কিন্তু প্রতিবার শিশু যখন স্তন চোষে, সিগনাল পৌঁছে যায় সঠিকস্থানে। প্রায় দশগুণ বেশি মাত্রায় প্রোল্যাকটিন নিঃসৃত হয়, প্রায় ঘণ্টা ব্যাপী হরমোনটির কার্যকারিতা স্থায়িত্ব পায়।

সুতরাং জন্মের পরপরই সঠিকভাবে শিশুকে স্তন চুষতে না দিলে প্রোল্যাকটিনের অভাবে দুগ্ধোৎপাদন মাত্রা কমে যেতে বাধ্য। এটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কীভাবে বাড়ানো যাবে

স্তন্যদানের জন্য মায়ের দ্বিধাহীন ইচ্ছেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জন্মের ত্রিশ মিনিটের মধ্যে বোঁটা চুষতে দিতে হবে।

ইদানিং বলা হচ্ছে জন্মের অব্যবহিত পরপরই, এমনকি নাড়ি কাটার আগেই শিশুকে বোঁটা চুষতে দিন। ফলে গর্ভফুলও সহজে বেরিয়ে আসে।

জন্মের প্রথম আধ ঘণ্টা বয়সে শিশু সবচেয়ে বেশি জোর প্রয়োগ করে বোঁটা চুষতে পারে। ফলে অক্সিটোসিন এবং প্রোল্যাকটিনের নিঃসরণ স্বাভাবিক থাকবে। দুধও আসবে পর্যাপ্ত পরিমাণ।

মায়ের মনে শান্তি-প্রশান্তি বজায় রাখার জন্য স্বামীসহ পরিবারের অন্যান্যদেরও বিরাট দায়িত্ব রয়েছে।

উপরোক্ত নিয়মগুলো পালন করলে অবশ্যই দুগ্ধোৎপাদন ও নিঃসরণ বাড়বে, তবুও কেউ যদি ইচ্ছে করেন কালোজিরে চিবিয়ে খেতে পারেন।

এক চা চামচ তিনভাগে ভাগ করে দিনে তিনবার খেতে পারেন। এটি ভালো দুগ্ধোৎপাদক।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অপুষ্ট মাও অনায়াসে শিশুকে বুকের দুধ দিয়ে বড় করতে পারেন। কুসংস্কার মুক্ত হয়ে দ্রুত স্তন চুষতে দেওয়াটিই মুখ্য বিষয়।

তবে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে প্রচুর, রক্তশূন্যতা রোধ করতে হবে মাকে।

শিশুর বুদ্ধির বিকাশ ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতায় বুকের দুধের গুরুত্ব

শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধের কোনো তুলনা চলে না, কোনো ধরনের বিতর্কেরও সুযোগ নেই।

শিশুর বৃদ্ধি, ধীশক্তির বিকাশ এবং বেঁচে থাকার জন্য বুকের দুধের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, এই উপলদ্ধিরও বিকল্প নেই।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে সব শিশু বুকের দুধ পান করে না বা পান করার সুযোগ পায় না তারা অধিক হারে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন, ডায়েরিয়া, নিউমোনিয়া, কানের প্রদাহ, অপুষ্টি, প্রভৃতি রোগে ভুগে থাকে। বলা বাহুল্য যে, উল্লেখিত রোগগুলোই শিশু মৃত্যুর প্রধান কারণ।

বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত একটি শিশু এবং দুধ পান করে এমন একটি শিশুর ডায়েরিয়া এবং নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার হার ১৪ঃ ৪।

সন্তান জন্মের পর পরই যে দুধটি বের হয় তাকে শালদুধ (Colostrum) বলে। শাল দুধে থাকে প্রচুর শ্বেত কণিকা, এই কণিকা শিশুকে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করে থাকে।

'শুধুমাত্র বুকের দুধ দান' (Exclusive Breast feeding) শিশুর পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধির রসদ জুগিয়ে থাকে।

যেসব শিশু বুকের দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ পায় তারা তীক্ষ্ণ মেধাবী হয়। তাদের মনোদৈহিক বিকাশও চমৎকার হয়। পরবর্তী জীবনে এসব শিশুদের ক্যান্সার এবং হৃদরোগে ভোগার হারও কম।

নবজাত শিশুর প্রধান প্রভৃতিগত চাহিদা স্তন চোষাতেই পূর্ণ, পরিতৃপ্ত। ইচ্ছে মতো শিশু বোঁটা পুরে নেয় মুখে, ইচ্ছে মতো চোষে। ইচ্ছে পূরণ হওয়ার মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পর্বটি লুকিয়ে আছে।

বোতলের বোঁটার ছিদ্র বড় হলে শিশুর পরিতৃপ্তির আগেই দুধ শেষ হয়ে যায়। আবার ছিদ্র ছোট হলে টানতে টানতে শিশু কাহিল হয়ে পড়ে। অনেকে তাই বিশ্বাস করেন, বোঁটা চোষা এবং পরিতৃপ্ত হওয়ার ব্যবধানের কারণেই বোতলের দুধ খাওয়া শিশুদের আঙুল চোষার হার খুব বেশি। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে বোতলের দুধ খাওয়ার কারণে প্রতিদিন চার হাজার শিশু মৃত্যুবরণ করে থাকে।

বুকের দুধ দান ঃ মায়ের উপকারিতা

জন্মের পরপরই বুকের দুধ খাওয়ালে তাড়াতাড়ি গর্ভফুল বেরিয়ে আসে, রক্ত ক্ষরণও কম হয়।

বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য স্তনের কাঠামোগত কোনো ক্ষতি হয় না বরং দুগ্ধদানের কারণেই নিয়মিত মাসিক বন্ধ থাকে (Lactational Amenorrhea)। ফলে মহিলারা রক্ত খোয়ানো থেকে রেহাই পান, রক্তশূন্যতা কমে আসে, শরীর ক্রমশ ঝরঝরা হয়ে থাকে।

মাসিক বন্ধ থাকার কারণে সন্তান জন্মদানে সক্ষম মহিলারা এভাবেই প্রকৃতিগতভাবে জন্ম নিরোধ ব্যবস্থা পেয়ে যাচ্ছেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে আবার গর্ভবতী হওয়ার রিস্কও কমে যাচ্ছে, কমছে মায়ের পঙ্গুত্ব, কমছে মৃত্যু হার।

স্তন্যদানের কারণে মায়েদের ক্যালসিয়াম এবং প্রোটিন ক্ষয় হয়। তাই খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে, পুষ্টিকর খাদ্যের পাশাপাশি প্রতিদিন অন্তত আধা লিটার দুধ খাওয়া উচিত মাকে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে— নিয়মিত স্তন্যদানকারী মায়েদের ডিম্বাশয় এবং স্তনে ক্যান্সার হওয়ার হার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কম।

আরো এক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে— কেবল মাত্র বুকের দুধ দানকারী মহিলারা সহজে মুটিয়ে যান না। এমন কি মেদবহুল মহিলারাও সহজেই ওজন কমিয়ে ফেলতে পারছেন। সুতরাং নিয়মিত দুগ্ধদান— মহিলাদের স্লিম থাকার একটি বড় সুযোগ সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে।

বুকের দুধ খাওয়ানোর মধ্যে মা এবং শিশুর মাঝে ঐশ্বরিক এক বন্ধন সৃষ্টি হয়, এই বন্ধন শিশুর ধীশক্তি বিকাশসহ সামাজিক বিকাশকেও বিকশিত করে। সুখী

এবং সমৃদ্ধ পরিবার গঠনের জন্য এই বন্ধন অত্যাবর্শকীয়। প্রগতির নামে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এই বন্ধন জন্মসূত্র থেকে দৃঢ়তর করতে হবে। আশার কথা এই যে, পশ্চিমা দেশগুলোতেও বিষয়টির উপলব্ধি অনেক বেড়েছে, মায়েরা শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর নিম্নগামী হার রোধ করার জন্য এগিয়ে আসছেন।

পূর্বেই বলেছি, শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোর মধ্যে জাতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ও জন্মনিয়ন্ত্রণ জড়িয়ে আছে।

প্রসবোত্তর কালীন ছয় মাসে দেখা গেছে, ৯৮ শতাংশ গর্ভনিরোধ ফলাফল আসে কেবলমাত্র শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে। এই রেজাল্ট বাংলাদেশে প্রচলিত সব জন্মনিরোধ ব্যবস্থার অর্জিত যোগফলেরও অধিক।

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর শিশু ফর্মূলার পাউডার দুধ আমদানী করতে পাঁচ শ' মিলিয়ন টাকা ব্যয় করে থাকে। দেশের জন্য এটি একটি বিশাল খরচের ব্যাপার।

বুকের দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে একটি পরিবার মাসে কমপক্ষে এক হাজার টাকা বাঁচাতে পারে। শিশু ফর্মূলার দুধ আমদানীতে বাধা দেওয়ার চেয়ে বড় সুযোগ আর নেই।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রতিও আমরা নজর দিতে পারি। দুগ্ধদানকারী মায়েদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 'তারা যেন দু'বছর পর্যন্ত শিশুকে বুকের দুধ দান করে।'

সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ শিক্ষা এবং কুরআনের শিক্ষা একত্র করে আমরা উন্নয়নশীল দেশে বুকের দুধ খাওয়ানোর নিম্নগামী হার রোধ করতে পারি, পারি প্রতিবছর ১.৫ মিলিয়ন শিশুর জীবন রক্ষা করতে।

'শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো' বলতে কি বোঝায় ?

- জন্মের পরপরই যতো দ্রুত সম্ভব, আধ ঘণ্টার মধ্যেই শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে।
- জন্মের প্রথম পাঁচ মাস শুধুমাত্র বুকের দুধই খাওয়াতে হবে।
- পানি, মধু ইত্যাদি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই।
- শিশুর চাহিদা মিটিয়ে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। রাতেও চাহিদা পূর্ণ করতে হবে।

বুকের দুধ খাওয়ানো ঃ পাঁচটি প্রধান তথ্য

- জন্মের পরপরই বুকের প্রথম শালদুধ খাওয়ান।
- গর্ভবতী ও প্রসূতি মাকে তার পুষ্টি এবং শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশি করে খাবার খেতে হবে।
- পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত বুকের দুধই যথেষ্ট।
- শিশুর বয়স পাঁচ মাস পূর্ণ হলে বুকের দুধের পাশাপাশি শিশু উপযোগী অন্যান্য পারিবারিক খাদ্য (Weaning Food) খেতে দিতে হবে।

যে কোনো অসুখের সময়ও শিশুকে বুকের দুধ ও অন্যান্য খাবার বারে বারে খেতে দিন।

মাতৃদুগ্ধ দান ঃ সফল পদক্ষেপ

অনেক মা-ই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে চান, কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে তিনি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, এই উদ্বিগ্নতা প্রকৃত পক্ষে দুধ উৎপাদন ব্যাহত করছে। মা হতাশ হয়ে পড়ছেন এবং বোতলের দুধের প্রতি ঝুঁকে যাচ্ছেন।

মায়ের দুধ দানে ব্যর্থতার মূখ্য কারণ তিনটি।

প্রথমত ঃ আত্মবিশ্বাসের অভাব।

দ্বিতীয়ত ঃ হাতের কাছে শিশু ফর্মূলা দুধের বোতল থাকা।

তৃতীয়ত ঃ বারবার শিশুকে বোঁটা চুষতে না দেওয়া। বোঁটা চুষতে না দিলে উৎপাদনের জন্য সিগনাল ব্রেণে পৌঁছবে না, হরমোন নিঃসরণ হবে না। দুধ কম আসছে ভেবে মা যদি বোতলের দুধের প্রতি ঝুঁকে পড়েন, ভরাডুবি হবে তখনই।

একবার বোতলের দুধ খাওয়ানো শুরু করলে, শিশু আর স্তনের বোঁটা চোষার ব্যাপারে আসক্তি পায় না। সফল দুগ্ধদানের জন্য বোঁটা চুষতে দেওয়াটিই মূখ্য। প্রতিটি মাকে বিষয়টি মনে রাখতেই হবে।

দশটি পদক্ষেপ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের যৌথ ঘোষণা অনুযায়ী শিশুর জন্মের সময় ও পরবর্তী কয়েক মাস শিশুর সুস্বাস্থ্যের জন্য সবার যা জানা বা করা উচিত ঃ

মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে একটি লিখিত নীতিমালা যা স্বাস্থ্য সেবার সঙ্গে জড়িত, তা সকলকে নিয়মিতভাবে অবহিত করতে হবে।

স্বাস্থ্য সেবার সঙ্গে জড়িত সকল কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা এই নীতি সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

সকল গর্ভবতী মাকে বুকের দুধের গুণাবলী এবং কীভাবে বুকের দুধ যথাযথভাবে পাওয়ার জন্য যত্ন নিতে হয় তা জানাতে হবে।

শিশুর জন্মের ত্রিশ মিনিটের মধ্যে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মাকে সহযোগিতা করতে হবে।

শিশুকে সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। শিশু ও মা এক সঙ্গে না থাকলেও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কীভাবে করা যায় তা মাকে শেখাতে হবে।

নিতান্তই চিকিৎসার প্রয়োজন ব্যতীত শিশুকে বুকের দুধ ছাড়া অন্য কোনো খাবার বা পানীয় খাওয়াবেন না।

মা ও শিশুকে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা একই সঙ্গে থাকতে দিন।

শিশুর চাহিদা মতো বুকের দুধ খাওয়ান।

শিশুর মুখে কোনো কৃত্রিম টীট, প্যাসিফাইয়ার, ডামি দেবেন না।

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সহযোগী দল গঠনে উৎসাহ দিন। মা হাসপাতাল বা ক্লিনিক ছেড়ে যাবার সময় সেসব দলের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারবে, উপকৃত হবে।

সফলতার সাথে বুকের দুধ খাওয়ানোর পদ্ধতি

পূর্বেই বলা হয়েছে স্তনের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা দুগ্ধগ্রন্থি থেকে দুধ উৎপাদিত হয়, দুগ্ধনালী বেয়ে সেই দুধ স্তনের সম্মুখের কালো অংশের নিচে সাইনাসে জমা হয়। স্তনের বোঁটাতেই এই সাইনাসগুলোর মুখ রয়েছে। শিশু অবশ্যই বোঁটার চারপাশের কালো অংশ পুরোটা না পারলেও বেশিরভাগ অংশ মুখে পুরে চুষবে, যাতে তার মাড়ি দিয়ে চাপ দিয়ে সাইনাসগুলো থেকে দুধ নিঙড়ে নিতে পারে।

শিশু যখন ক্ষুধার্ত হয়, মায়ের কোলে বা পাশে থাকলে হাত দিয়ে স্তন খুঁজতে থাকে, বোঁটার স্পর্শেই কেবল শিশু স্তনের সন্ধান পায়। শিশু যেন সহজেই বোঁটা খুঁজে পায়, সেদিকে নজর দিতে হবে। প্রয়োজনের সময় বোঁটা মুখে ছোঁয়ালে, হা করে শিশু বোঁটার দিকে ফিরবে। কখনোই আঙুল দিয়ে গাল চেপে ধরে জোর করে বোঁটা মুখে পুরে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়।

এ ধরনের চেষ্টা শিশুর মানসিক বিকাশে বাধার সৃষ্টি করবে। পরবর্তীতে শিশুটি হয়তো স্বভাবে জেদী এবং বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। স্তনের বোঁটা শিশুর ওপরের ঠোঁটে ঘোরাতে হবে।

তুলোর দলা সাহায্যে সহনশীল উষ্ণতায় গরম পানিতে ভিজিয়ে প্রত্যেকবার দুধ খাওয়ানোর আগে এবং পরে দুধের বোঁটা পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরিষ্কার ও শুকনো থাকলে বোঁটায় চিড় ধরে না। একবার বোঁটায় চিড় ধরলে সফলভাবে দুধ খাওয়ানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

বসে বা শুয়ে দুধ খাওয়াতে পারেন।

বসা অবস্থায় পিঠ টানটান থাকবে, সামনে ঝুঁকবেন না।

বসতে না পারলে শুয়ে নিন।

নিজের অস্থির কিংবা উত্তেজনাকর অবস্থায় দুধ না খাওয়ানোই ভালো। কারণ এ সময় দুধের প্রবাহ কম থাকবে, শিশু অতৃপ্তিতে ভুগবে। কষ্ট হবে দু'জনেরই।

দুধ দেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশু শ্বাসক্রিয়া ঠিক মতো চালাতে পারে, ঠেসে ধরার কারণে তার শ্বাস প্রশ্বাসে যেন বাধার সৃষ্টি না হয়।

প্রথমে একপাশের স্তন খাওয়ান, নিঃশেষ হলে অন্য পাশেরটি খাওয়াতে হবে। এভাবে ওলোটপালোট করে দুধ নিঃশেষ করানো গেলে দুধের প্রবাহও বেড়ে যাবে।

শিশু যেন অল্পদুধ খেয়ে ঘুমিয়ে না পড়ে, নজর রাখবেন। ঘুমিয়ে গেলে পা সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে আবার খেতে দিন।

সঠিকভাবে স্তনের বোঁটায় শিশুর মুখ স্থাপন করার লক্ষণগুলো কি কি ?

শিশুর বুক ও পেট, মায়ের বুক ও পেটের সাথে লাগানো থাকবে, মাথা থাকবে মুক্ত।

শিশু বড় করে হা করা অবস্থায় স্তনের কালো অংশের সবটুকু, কিংবা বেশির ভাগ অংশ মুখের ভেতর রাখবে। শিশুর নিচের ঠোঁট থাকবে বাহিরের দিকে ওল্টানো।

এ সময় তার মুখ ও থুতনি থাকবে স্তনের সাথে লাগানো।

দেখা যাবে শিশুটি এ সময় নিবিড় করে স্তন চুষছে, গিলছে। সে থাকবে শান্ত। মুখ থাকবে গোলাকার।

মা বোঁটায় কোনো ব্যথা অনুভব করবে না। স্তনের ত্বক থাকবে সবল, সতেজ। স্তন থাকবে গোলাকার, মায়ের মধ্যে থাকবে আরাম ও স্বস্তিদায়ক শিথিলতা।

দুধ খাওয়ানোর পর ঢেকুর তোলাতে হবে শিশুকে, কেন ? কিভাবে ?

বোঁটা চুষে দুধ টেনে নেয় শিশু, সাথে সাথে টেনে নেয় বেশ কিছু পরিমাণ বাতাস। ফলে পেট ফেঁপে ওঠে, অস্বস্থিকর অবস্থার সম্মুখীন হয় শিশুটি, পেটে ব্যথাও হতে পারে।

শুয়ে থাকা অবস্থায় শিশুটি টেনে নেওয়া বাতাস বের করতে পারে না। যদিবা হঠাৎ ঢেকুর ওঠার কারণে কিছু বাতাস বের হয়, সাথে সাথে অনেক সময় বেশ কিছু পরিমাণ দুধও বেরিয়ে আসে। অনেক মা-ই ঘটনাটিকে সহজভাবে নিতে পারেন না। শিশুটি বমি করছে ভেবে তারা শংকিত হন। শংকিত হওয়ার কারণও আছে।

১। এ অবস্থায় দুধ খাওয়ানোর পর শিশুকে কোলে বসিয়ে পিঠে হালকা করে চাপড় দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

২। অথবা আস্তে আস্তে কাঁধে তুলে শিশুর পেট পনেরো মিনিটের মতো কাঁধের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা উত্তম। এতে ঢেকুর ওঠার কারণে পেটের ভেতরের অতিরিক্ত বাতাস বেরিয়ে যাবে, বমি হবে না।

৩। দুধ খাওয়ানোর পর শিশুকে ডান কাত করে বিছানায় শোয়ানো নিরাপদ। এ অবস্থায় হজম বাড়বে। কিন্তু যদি বমি করেও ফেলে বমি করা দুধ চাদরে পড়বে, নাকে মুখে জমে শিশুর শ্বাসক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করবে না।

স্তনের ডেবে থাকা বোঁটা ঃ কীভাবে চুষবে শিশু

দুধ কমবেশি আসার ব্যাপারে স্তনের বোঁটার আকারের কোনো গুরুত্ব নেই। তবে বোঁটা ডাবানো থাকলে, মুখে পুরতে অস্বস্তিবোধ করে শিশু। সে অবস্থায় শিশু কাঁদতে থাকে, ঝাঁকি দিয়ে মাথা সরিয়ে নেয়।

এক্ষেত্রে কিছুটা যত্নবান হলে, কৌশল অবলম্বন করলে, অস্বস্তিকর অবস্থা কাটিয়ে ওঠা যায় ঃ

১। ঘুম থেকে ওঠার সাথে সাথে শিশুকে বোঁটা চুষতে দিন।

২। যদি প্রথম পদক্ষেপেই সে কাঁদতে শুরু করে, তবে খাওয়ানোর চেষ্টা পরিত্যাগ করুন। শিশুকে সহজ হতে দিন, কিছুটা সময় নিন, আবার চেষ্টা করুন।

৩। ডাবানো বোঁটা একটু একটু ম্যাসাজ করে কিছুটা বের করে আনা যায়। প্রতিবার খাওয়ানোর পূর্বে একটু একটু ম্যাসাজ করবেন, কয়েকদিন পর দেখবেন অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

কিছু কিছু মায়ের স্তনের বোঁটা প্রকৃতই ডাবানো থাকে, ম্যাসাজ করেও ভালো ফল পাওয়া যায় না। এমন পরিস্থিতিতে দুধের আধিক্যের ফলে বোঁটা আরো বেশি ভেতরের দিকে ডেবে যায়, কিছুতেই বের করা যায় না।

এ অবস্থায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে নিপল শিল্ড ব্যবহার করলে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যাবে।

প্রতিবারে কতোক্ষণ খাওয়াবেন ?

প্রথম এক বা দুই সপ্তাহ প্রতিবারে সর্ব্বোচ্চ ১৫–২০ মিনিটের মতো খাওয়ানো যেতে পারে। এ সময় শিশুকে প্রায় দুই ঘণ্টা পর পর খাওয়ানো উচিত। তবে শিশুটির প্রয়োজনের তাগিদটিও মূল্যায়ন করতে হবে।

স্তন্যদান অনেক সময় হয় যন্ত্রণাপূর্ণ। অনেক মা তাই সময় বাড়ান ধীরে ধীরে।

না, এটি মোটেও ঠিক নয়। শুরুতেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুষতে দেওয়া উচিত।

দিনে কতোবার খাওয়ানো উচিত ?

এক অর্থে যতোবার শিশু ক্ষুধার্ত হবে, ততোবারই দুধ খাওয়ানো উচিত।

কিন্তু দেখা গেছে কোনো কোনো মা আধ ঘণ্টা পর পরই শিশুকে দুধ খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে শিশু তৃপ্তি সহ খেতে পারলো না, অল্প খেয়ে আর খেলো না।

এটি কি উচিত? উচিত নয় মোটেই।

আর এক অর্থে বলা যায় শিশু যতোবার কাঁদবে, ততোবারই খাওয়ানো উচিত।

কিন্তু ক্ষুধা ছাড়াও আরো অনেক কারণে শিশুটি কাঁদতে পারে, সেটিও খেয়াল রাখতে হবে।

ক্ষুধার কথা ভেবে, কান্নায় অস্থির হলে হয়তো অনভিজ্ঞ কোনো মা সারাদিন ব্যাপী এবং মাঝরাত পর্যন্ত শিশুকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে অধৈর্য, অস্থির কিংবা কাহিল হয়ে পড়েছেন এই অবস্থায় বুকের দুধের উৎপাদন এবং প্রবাহ কমে যেতে বাধ্য।

তাই এটিই যথার্থ যে, প্রতিবার খাওয়ানোর সময় পরিপূর্ণ তৃপ্তি মিটিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে আর দুধ দেবেন না।

চাহিদা অনুযায়ী যেসব শিশুকে দুধ খাওয়াতে হয়, প্রতিবার সর্বোচ্চ ২০ মিনিট দুধ দিন।

যখন দুধের প্রবাহ সম্বন্ধে আত্ম বিশ্বাস জাগবে, শিশুর ক্ষুধা এবং অন্যান্য সুবিধে অসুবিধে সম্বন্ধে মায়ের বোঝার ক্ষমতা বাড়বে, নিজের বুদ্ধির ওপর বিবেচনা করেই, যতোবার ইচ্ছে, যতোক্ষণ ইচ্ছে খাওয়াতে পারেন।

অর্থাৎ নবজাত শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট সময় তালিকা থাকতে নেই।

থাকতে হবে মায়ের কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং উপলব্ধি।

রাতে কীভাবে দুধ দেবেন ?

জন্মের পর থেকেই রাত দশটার পর দুধ দিয়ে কমপক্ষে দুটোর মধ্যে আরো একবার খাওয়াতে হবে।

ছয় থেকে আট সপ্তাহ পর্যন্ত এভাবে চালানো উচিত।

এই বয়সে একবারে খাওয়ার পরিমাণ খুব কম। তাই একবার খেয়ে পুরো রাত তারা কাটাতে পারে না।

রাতে যখন ঘুম থেকে উঠবে, কাঁদবে শিশুটি। দুধ খেতে দিন তখন।

রাতে খাওয়ালে বদঅভ্যাস হবে, এমনটি ভাববেন না কখনো।

অভ্যাসের মধ্যেমে ক্রমশ বুঝাতে হবে, রাত হচ্ছে ঘুমোনোর সময়। নিয়ম মতো অভ্যাসের পরিচর্চা করতে পারলে শিশুদের নিকট থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যাবে।

প্রথম দু'মাসের পর শিশুর ওজন যদি সন্তোষজনক ভাবে বাড়ে, তবে তাকে রাত দুটোর সময় ধীরে ধীরে খাওয়ানো বন্ধ করে দিতে পারেন।

কোনো কোনো শিশু হয়তো দিনের বেলায় বেশি বেশি ঘুমোয় রাতে ঘন ঘন খাবার চায়। আবার কোনো কোনো শিশু ঠিক উল্টোটি করে। তাই অনেকে মনে করেন, শিশুর জাগরণ ও ঘুমের এই নিজস্ব ধারাকে জোর করে পরিবর্তন করা উচিত নয়।

অভ্যাস পরিচর্চার মাধ্যমে স্বভাব বদলানো না গেলে মা ও শিশুর যৌথ প্রয়োজনের সমন্বয় সাধন করাই উত্তম। এক্ষেত্রে মাকেই শিশুর প্রয়োজনের সঙ্গে নিজের ঘুম ও জাগরণ চক্রের সমন্বয় করে নিতে হবে।

মনে রাখা দরকার, শিশু যখন থেকে সন্ধ্যায় শক্ত খাবার খেতে পারবে, তখনো সারারাত কাটানোর জন্য তাকে রাত দশটার সময় দুধ খাওয়াতে হবে।

শিশু কী পর্যাপ্ত দুধ পাচ্ছে, কীভাবে বুঝবেন ?

হ্যাঁ, শিশুটি পর্যাপ্ত দুধ পাচ্ছে কি না বোঝা যায়।

দুধ খেয়ে শিশুর সন্তুষ্টি অর্জিত হচ্ছে কি না, আনুপাতিক হারে বয়সের সাথে সাথে ওজন বাড়ছে কি না, এসব পর্যবেক্ষণ করা খুবই জরুরী।

পরিতৃপ্তি সহকারে আশ মিটিয়ে শিশুর দুধ পান করা থেকে একজন দক্ষ মা অনেক কিছুই বুঝতে পারেন, শিশুর মুখের শান্তি মাকে যেন বলে দেয় সে তৃপ্ত, পর্যাপ্ত দুধ খেলো এই মাত্র।

শিশুটি নিয়মিত দুধ খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে, ওজনও বৃদ্ধি পাচ্ছে সঠিক আনুপাতিক হারে। নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, শিশুটি পর্যাপ্ত দুধ পাচ্ছে।

এভাবে কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী শিশুর আচার আচরণ ও ওজন বৃদ্ধি পর্যালোচনা করে, একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। তবে একক মানদণ্ড কোনোভাবেই মূল সিদ্ধান্ত দিতে পারে না।

কোনো নবজাতকের ওজন যদি সঠিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু প্রতিদিন বিকেলে বা সন্ধ্যায় চিৎকার করে কাঁদে, বুঝতে হবে দুধ সে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাচ্ছে ঠিকই তবে পেটে তার শূল বেদনা (Colic Pain) হচ্ছে।

শূল বেদনা প্রায় তিন মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। এ সময় নবজাতকের ওজন বৃদ্ধির কমতি হয় না।

সে শিশুটি দুধ খেয়ে তৃপ্ত থাকে, ওজন বাড়ে মন্থর গতিতে, তাকে বলা হয় ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শিশু (Slow gainer Baby)

কিছু কিছু শিশু আছে যাদের ওজন মোটেও বাড়ে না, দুধ খাওয়ার জন্যেও কোনো তাগিদ নেই তাদের।

এই ধরনের শিশুরা বেশির ভাগ সময় ক্ষুধার্ত থাকে। থাকে অবসাদ গ্রস্ত, ক্লান্ত, মলিন।

এদের প্রস্রাব থাকে রঙিন ও দুর্গন্ধযুক্ত। মলত্যাগেরও কোনো নিয়ম নীতি থাকে না।

খুবই ধীর গতিতে এদের ওজন বাড়লেও বাড়তে পারে। এরাই মূলত অপর্যাপ্ত দুধ পেয়ে থাকে।

যদি কোনো শিশুর দুই সপ্তাহ বয়স শেষ হওয়ার পরও ওজন বাড়ার লক্ষণ বোঝা না যায়, দুই-তিন ঘণ্টা পর পর তাকে ঘুম থেকে তুলে দুধ পান করানোর ব্যাপারে উৎসাহ জোগাতে হবে।

যেসব শিশু দুধ মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে দিন, অন্য স্তনের বোঁটা চুষতে উৎসাহিত করুন।

প্রতিবার স্তন্যদানের সময় যদি চার/পাঁচ বার এই প্রক্রিয়াটি চালানো যায়, তবে অধিকাংশ শিশুর ওজন বাড়া শুরু হবে। পাঁচ/সাত দিনের মাথায় শিশুটির দুধ খাওয়ার আগ্রহ গ্রহণযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

মন্তব্য

ধীশক্তি বিকাশের ধারাবাহিকতায় বুকের দুধ নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করার পিছনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

দেখা গেছে যেসব শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে বুকের দুধ পায় তারা হয় তীক্ষ্ণ মেধাবী, এদের মনোদৈহিক বিকাশও চমৎকার। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রতিটি মা'র জানার প্রয়োজন অত্যাধিক।

শিশু কীভাবে কথা বলতে শেখে, কীভাবে উন্নত করা যায় বাচনভঙ্গি

যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে কথা বলা, সাবলীল বাচনভঙ্গির মাধ্যমে নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে অন্যকে জানানোর মধ্য দিয়েই অনুভূতির বিকাশ ঘটে থাকে। সমস্যা তুলে ধরা যায়, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, সমাধানও পাওয়া যায় কথোপকথনের মাধ্যমে।

জন্মগতভাবেই একই ইচ্ছে ধারণ করে শিশুরা বাড়তে থাকে– অন্যের সাথে নিজের বন্ধন সৃষ্টি করার উপায় বের করে নেয়। মুখে আধো আধো বোল ফোটার আগেই নানাভাবে তারা অপরের তথ্য সংগ্রহ করে, নিজের ইচ্ছের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। মাধ্যমগুলো হচ্ছে ঃ

চোখ ঃ বলা হয়ে থাকে চোখ ভেতরের দর্পণ। আসলেই তাই। শিশু অবুঝ, কিন্তু আপনার দিকে তাকিয়ে অনেক কিছুই বুঝে নিতে পারে। সৃষ্টির এ এক বিস্ময়কর খেলা। আপনিও গভীরভাবে নজর রাখুন, ধীরে ধীরে তার ইচ্ছে-অনিচ্ছে, মানসিক অবস্থা, চাহিদা সবই বুঝতে পারবেন।

জন্মের পর থেকেই শিশুরা দেখতে পায়, নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে যখন চোখের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটতে থাকে, বস্তু, মানুষ ও রঙ সম্বন্ধে ধারণা করতে শেখে, আলোর প্রতিবিম্বের পরিবর্তন করে পরিষ্কার করে দেখার চেষ্টা করে, চোখের গতি নিয়ন্ত্রণ করে অদৃশ্য এক যোগাযোগ স্থাপন করে নেবে আপনার সাথে। কথা বলার পূর্বেই চোখ এভাবে বন্ধন সৃষ্টি করে।

কণ্ঠস্বর ঃ কান্না, চেঁচানো, গলগল শব্দ করা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিচার করে থাকি আমরা। হ্যাঁ, স্বাভাবিকই। তবে প্রতিটি ভঙ্গিমায় শিশুটি ভিন্ন ভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে থাকে। গুণী মা-ই সব বুঝতে পারে। স্বাভাবিক স্বরের বিকাশের পথকে সহজ করে তুলতে পারে।

মুখের অভিব্যক্তি ঃ নিজের আনন্দ, ক্ষোভ এবং প্রশান্তি প্রকাশ করে থাকে মুখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে।

অন্যের নজর কাড়ার আর একটি মাধ্যম হচ্ছে, হাত-পা ছোঁড়া, ধাক্কা দেওয়া, খামছে ধরা বা অঙ্গুলি নির্দেশ করে কিছু একটা বোঝানো।

কীভাবে বাচনভঙ্গি ও শব্দ উচ্চারণে দক্ষতা বাড়ানো যায়

কথা বলা শেখার পূর্বেই, শিশুরা ভেতরের ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চায়। ব্যর্থ হলে মেজাজ হয় খিটখিটে, হতাশ। যখন শব্দ উচ্চারণ করতে শেখে তখন বদ-স্বভাবগুলো চলে যায়, চারপাশ হয়ে ওঠে আনন্দময়, বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এ সময় শিশুকে সঠিক অর্থপূর্ণ বাচনভঙ্গি শেখাতে সচেষ্ট থাকতে হবে। কয়েক বৎসরের সফল চেষ্টার পরই পরিপূর্ণ ভাবে কথা বলতে শিখবে। নিচের প্রত্যেকটি বিষয়ই আপনার শিশুর বাচনভঙ্গি ও শব্দ উচ্চারণে দক্ষ করে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঃ

শিশুর সাথে কথা বলা ঃ বেশিদিন আগে জন্মায়নি এমন শিশুর সাথে প্রতিটি মা বাবা বা বয়স্কদের সহজাতভাবে কথা বলা উচিত। ঘুম থেকে ওঠার পরই শিশুটিকে আদর মেখে কোলে তুলে নেই আমরা। কপোত কূজনের মতো মধুর সুরে নানা ধরনের শব্দ ব্যবহার করি। এ বয়সে কী ধরনের শব্দ ব্যবহার করছেন সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। মূল ব্যাপার হচ্ছে, এ সময় শিশুটি কথা শুনতে চায়, প্রবৃত্তিগত কারণেই।

শোনা ঃ শিশুরা শব্দ সম্পর্কে খুবই সচেতন, চায় কেউ কথা বলুক। শব্দ শুনে সে শান্ত হয়, বক্তার মুখের দিকে নিবিড় করে তাকিয়ে থাকে। যতই বয়স বাড়তে থাকবে, শিশুটি নানাধরনের ধ্বনি করতে পারে, ধীরে ধীরে শব্দটি আংশিক অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। যখন বড়রা তার সামনে অর্থপূর্ণ শব্দটি বারবার উচ্চারণ করবে, অপূর্ণতা পূর্ণ হয়ে উঠবে। চমৎকার সব শব্দ অতি দ্রুত অনুকরণ করে সে শিখে নেবে।

রেডিও, টেলিভিশনের কথা শুনে কদাচিৎই সে শিখতে পারে। কারণ তার সামনে সেরকম কথা বলতে হবে, যা সে তার বোধগম্য হবে এবং সহজে অনুকরণ করতে পারবে।

শব্দ করার চেষ্টা করা ঃ শিশুরা নিজেদের স্বর ব্যবহার করে নানাভাবে আনন্দ পেয়ে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়তো নানা রকম ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকে। যেমন কলকল করে হড়বড়িয়ে আধো আধো কথা ফুটতে থাকে, ডুবে যায় নিজের মাঝে। আসলে 'পরিপূর্ণ শব্দ' ব্যতিরেকেই উচ্চারিত ধ্বনির মাধ্যমে অন্যের নজর কেড়ে নেয়, অদৃশ্যভাবে এক ধরনের কথোপকথন চালিয়ে যায় তাদের সাথে।

শব্দ উচ্চারণ করার পূর্বেই বাড়ন্ত শিশুরা ওই শব্দের অর্থ বুঝতে পারে। সুতরাং কখনই শিশুর সামনে কুরুচিপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করা উচিত নয়। কথাটি সব সময় মনে রাখা জরুরী।

বাচনভঙ্গি বিকাশের স্তর

সব শিশুরা একই বয়সে কথা বলতে শিখতে পারে না। অনেকে তাড়াতাড়ি শেখে, অনেকের একটু দেরি হয়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই আগে কথা বলতে শেখে। বাচনভঙ্গি শেখার পেছনে সাধারণ একটি ধারা রয়েছে। নিচে গড় বয়স অনুযায়ী সেই স্তরটি তুলে ধরা হয়েছে ঃ

নবজাতক ঃ মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে নবজাতকটি কান্না শুরু করে, কঠিন পৃথিবীতে তার আগমন বার্তা জানিয়ে দেয়। হিক্কা, ঢেকুর বা হাঁচি দেওয়ার সময়ও সে নানা ধরনের আওয়াজ করে।

এক মাস বয়স ঃ এ সময় শিশুটি অল্প অল্প ধ্বনি বা শব্দ আওড়ায়। ধ্বনিটি আসে গলার ভেতর থেকে। এ ধরনের শব্দকে বলা হয় Guttural sound।

৫–৬ সপ্তাহ ঃ ৫ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে শিশুটি নিজস্ব কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতে পারে, কপোত কূজনের মতো মধুর স্বরে কিছু বলতে চায়, গলার ভেতর থেকে গলগল করে শব্দ ব্যবহার করে অপরের কথার সাড়া দেয়।

তিন মাস ঃ তিন মাস থেকে শিশুরা আরো বেশি ধ্বনি আওড়াতে পারে। কারণ এই বয়স থেকেই সে ঠোঁট, জিহ্বা এবং স্বরযন্ত্রের (Larynx) পেশীর নড়চড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই গলার ভেতর থেকে অনবরত গলগল শব্দ বের করতে কোনো অসুবিধে হয় না, নিজের সাথে নিজেই খেলতে থাকে কলকল শব্দ করে।

কলকল শব্দ করেই অন্যের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তারা অধির থাকে। সাড়া পেলে আনন্দিত হয়, বাকশক্তি বিকাশের পথ ত্বরান্বিত হয়। অন্যের সাথে এভাবেই শিশুর নৈকট্য, আলাপচারিতা গড়ে ওঠে।

৬ মাস ঃ এ সময় নানা ধরনের শব্দ উচ্চারণ করতে পারে, যেমন– 'মা' 'কা' 'গু' 'দার' 'আদ্দা'। এ ধরনের ধ্বনি ব্যবহার করার জন্য প্রচুর সময় নেয়।

এ বয়সেই শিশুটি খেলার সময় মুখ টিপে হাসতে পারে, ভয়ে আর্তচিৎকার করে উঠতে পারে অথবা গোস্বার কারণে চেঁচাতে পারে।

৯ মাস ঃ 'মাম-মাম', 'দাদ-দাদ', 'বাব-বাব' এভাবে দ্বিত্ব স্বরে একই ধ্বনি বারবার উচ্চারণ করতে পারে। বড়দের মুখের কথাও অনুকরণ করতে পারে।

এক বৎসর ঃ শব্দের অর্থপূর্ণ ব্যবহার বুঝতে পারে। সাধারণত দুই-তিনটি শব্দ অর্থসহ বলতে পারে। যেমন– মা, আমার মা, বাবা বাবা, বাই-বাই। শব্দের অর্থ বোঝার সাথে তারা সাধারণ আদেশ নিষেধ পালন করার চেষ্টা করে। 'মার কাছে যাও'। 'এদিকে তাকাও'। ইত্যকার আদেশগুলো পালন করতে পারে।

বয়সের পরবর্তী ধাপে শিশুটি প্রচুর শব্দ শিখতে থাকে। শব্দ ব্যবহার করে নিজের সাথে নিজেই কথা বলার চর্চা করে। এ অবস্থায় শিশুটির নিজস্ব ভাষা শৈলী গড়ে ওঠে যার অর্থ কেবল মা-বাবা বা নিকটাত্মীয়রা বুঝতে পারে, অন্যেরা পারবে না। যেমন– তৃষ্ণা পেলে হয়তো সে চিৎকার জুড়ে দিলো, 'মাম দাও' 'মাম-মাম'। মা-ই বুঝতে পারে 'মাম' এর অর্থ। তিনি ছুটে যাবেন পানি আনতে, পানি পান করার পর তৃষ্ণা নিবারণ হবে, শান্ত হবে সে। কিন্তু অন্য কেউ হঠাৎ বাসায় এলে 'মাম' শব্দের অর্থ হয়তো বুঝবেন না। শিশুর চিৎকার থামাতে পারবেন না।

১৮ মাস ঃ ৬ থেকে ২০টি শব্দ বলতে পারে।

২ বৎসর ঃ পঞ্চাশের অধিক শব্দ ব্যবহার করতে পারে। দু'টি কিংবা তিনটি শব্দ মিলিয়ে একটি বাক্য দাঁড় করাতে পারে।

২১/২বৎসর ঃ আমি, তুমি, আমাকে, তোমাকে ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহার করতে পারে। হড়বড় করে কেবল প্রশ্ন করা শুরু করে।

তিন বৎসর ঃ সাধারণ কথাবার্তা চালাতে পারে, অবিরাম কথা বলতে চায়।

চার বৎসর বয়স ঃ ভাষা ব্যবহারে ব্যাকরণের নিয়মনীতি শিখে ফেলে, ফলে শিশুটির বক্তব্য হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ, সহজেই বক্তব্য বোঝা যায়।

উচ্চারণ

অল্প বয়সী বাড়ন্ত শিশুরা যখন কথা বলতে শেখে নানারকম ভুলত্রুটি করে থাকে। নিখুঁত ধ্বনি তৈরি করতে তারা সমস্যায় ভোগে। তাই ভুল উচ্চারণ করে কিংবা শুদ্ধভাবে শব্দ আওড়াতে পারে না।

যখন কোনো শব্দ বা ধ্বনিকে কঠিন মনে হয়, অতি সহজেই বিকল্প ঢংগে সেই শব্দ বা ধ্বনিটি উচ্চারণ করে। এ সময় শিশুর বিকল্প আধো আধো বোল অতি মধুর শোনায়। ঐশ্বরিক এক আনন্দধারায় সিক্ত করে মা-বাবার শরীর-মন। বিকল্প স্বর, যেমন–

'স' এর স্থলে 'ত' উচ্চারণ করে। 'সকাল' না বলে, বলবে 'তকাল' ইত্যাদি।

'থ' এর স্থলে 'ফ' বা 'ভ' উচ্চারণ করে। আরো অনেক বিকল্পধ্বনি মন মতো ব্যবহার করে।

উচ্চারণের জটিলতা সাধারণত পাঁচ/ছ' বৎসর বয়স থেকে আর থাকে না।

তোতলানো

দুই থেকে চার বৎসর সময়ে তোতলানো প্রক্রিয়াটি শুরু হতে পারে। যদিও এ সময় শিশুরা অনর্গল শব্দ করতে পারে, মাঝে মাঝে শব্দ বা শব্দের অংশ বিশেষ ছাড় দিয়ে দিয়ে বারবার উচ্চারণ করতে পারে, যেন সময়ের ফাঁকটুকুতে নিজেদের চিন্তাগুলো খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছে। একদিকে কথা বলার প্রচন্ড ঝোঁক, অন্যদিকে শব্দ তৈরিতে অদক্ষতা, ভেতরের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না, দ্রুততার সাথে কথা বলতে গিয়ে একটির পিঠে আর একটি শব্দ চড়িয়ে দেয়। এটি আসল তোতলানো নয়, বরং একটি অস্থায়ী সমস্যা যা ক্রমান্বয়ে দূর হয়ে যায়। তখনই 'পর্যায়টি' বিপর্যয় ডেকে আনে, যখন মা-বাবা ত্রুটিটুকু শোধরানোর জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন, বাড়াবাড়ি করেন। শিশুরা তখন শুদ্ধ করে কথা বলার ব্যাপারে অতি সচেতন হয়ে ওঠে, ভরাডুবি হয় তখনই, তোতলানো প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং সাবধান, নিজের দোষে সন্তানের ক্ষতি থেকে বিরত থাকুন।

মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে তোতলানোর হার বেশি। যে পরিবারের অন্য কেউ তোতলায়, সেই পরিবারের সন্তানেরও তোতলানোর সম্ভাবনা বেশি।

শিশুর আবেগ যদি প্রকাশের পথে প্রতিনিয়তই বাধা প্রাপ্ত হতে থাকে, তবে তোতলানো স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। বিষয়টি খেয়াল রাখুন। তোতলানো প্রক্রিয়াটি শুরু হলে সাইকিয়াট্রিস্ট বা স্পীচ থেরাপীস্টের শরণাপন্ন হোন।

ধীর গতিতে কথা বলতে শেখা

অনেক শিশুরই কথা শিখতে সময় লাগে বেশি। কারণও থাকে অনেক। যেমন ঃ

বিকাশের জন্মগত ধারা ঃ পরিবার ভেদে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। কিছুকিছু পরিবারের ধারাই এমন যে, শিশুরা কথা শিখতে সময় নেয় বেশি। ঘাবড়ানোর কারণ নেই। সময় বেশি লাগলেও শব্দ চয়ন এবং উচ্চারণে কোনো ধরনের ঘাটতি স্থায়ী হয় না।

হাঁটা চলা ঃ অনেক শিশু জন্মের প্রথম থেকেই হাঁটা চলার স্তরটি আগে এসে যায়। এ সময় এই প্রক্রিয়াটির প্রতি তারা এতই সচেতন থাকে যে কথা বলার ধাপটি বিলম্বে আসতে থাকে।

বয়স্করা যদি কথা শেখানোর প্রতি নজর না দেন ঃ শিশুরা সাধারণত বয়স্কদের থেকেই কথা বলতে শেখে। বড় পরিবারের বাড়ন্ত শিশুরা অনেক সময় অবহেলা, অযত্নে বেড়ে ওঠে। বড়দের থেকে সঠিক নজর পায় না। যমজ শিশুদের বেলায়ও এমন হতে পারে। একটি শিশু হয়তো কম নজর পাচ্ছে, একটি পাচ্ছে বেশি। কেউ হয়তো তলিয়ে দেখলো না ব্যাপারটি, এই হেরফের এর কারণেও উপেক্ষিত শিশুটির কথা বলতে দেরি হতে পারে।

উৎসাহের অভাব ঃ প্রবৃত্তিগত ভাবেই শিশুরা নতুন নতুন ধ্বনি আওড়িয়ে আনন্দ পায়, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। মনে প্রাণে চায়, বড়রাও তার আনন্দে শরিক হোক। কিন্তু বয়স্করা তাতে অংশ গ্রহণ না করলে শিশুটি নতুন ধ্বনি সৃষ্টিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

বধিরতা ঃ অন্যরা সামনা সামনি কথা বললেই শিশু তা শোনে। শুনে শুনেই শিখে নেয় নতুন ধ্বনি। কিন্তু শিশুটি যদি বধিরতায় আক্রান্ত হয় তবে, শুনতে পারে না শিখতেও পারে না কিছু। নিজের উচ্চারিত শব্দ বা ধ্বনিটিও তাকে শুনতে হবে, নইলে শব্দ গঠনের প্রচেষ্টা থাকবে না তার ভেতর। কথা বলতে সময় লাগবে অনেক বেশি অথবা আদৌ কিছু বলতেও পারবে না।

বধিরতা

কিছু কিছু শিশু জন্মগতভাবেই বধির হয়ে থাকে।

কানের প্রদাহ বা জখমজনিত কারণেও অনেকে স্থায়ীভাবে বধির হয়ে পড়ে, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থেকেও অনেক শিশু অস্থায়ী বধিরতায় আক্রান্ত হয়।

কেউ কেউ সম্পূর্ণ বধির হয়, কেউ হয় আংশিক। আংশিক বধিরতায় কিছু কিছু শব্দ শোনা যায়, অধিকাংশ শব্দই শোনা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে মৃদু স্বর শুনতে পায়, কিন্তু উচ্চস্বর শোনে না। তাই বড়রা যখন শিশুর সামনে বিভিন্ন আওয়াজ করেন কথা বলার সময়, অনেক অর্থই তারা বোঝে না।

অনেক ক্ষেত্রে বধিররা কেবল অতি উচ্চস্বর বা রাগান্বিত শব্দ শুনতে পায়, স্বাভাবিক কথন শুনতে পায় না। সুতরাং এসব শিশুরা নিজেদের বাচনভঙ্গি বিকাশের পথকে সাবলিল গতিতে টেনে নিতে পারে না, শব্দের সাথে স্বাচ্ছন্দময় আনন্দদায়ক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না।

যদি বধিরতা সনাক্ত করা না যায়, নানাভাবে শিশুটিকে দোষারোপ করা হয়। অলস কিংবা বোকা হিসেবে নির্মমভাবে ভর্ৎসনা করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এ সময় শিশুটি থাকে বিভ্রান্ত। শব্দময় পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না, হতাশ হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে, ধ্বংসের চূড়ান্তসীমায় পৌঁছে যায় সবার অলক্ষ্যে।

এ সময় নতুন কোনো তথ্য বা নির্দেশ দিলে পালন করতে পারে না সে, মা-বাবা বেপরোয়া আচরণ শুরু করেন, পরিস্থিতি শিশুটিকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে।

না, অস্থির হবেন না, খুঁটিনাটি সমস্যাগুলো আগে আপনাকেই সনাক্ত করতে হবে। শিশু বিষয়ক প্রয়োজনীয় জ্ঞান সঞ্চয় করুন, তবেই হতে পারবেন দক্ষ মা কিংবা বাবা।

কথা শেখার পথে বড় বাধা হচ্ছে বধিরতা

৬ মাস বয়স পর্যন্ত একটি বধির শিশু স্বাভাবিক শিশুদের মতোই গলার ভেতর থেকে বুদ্বুদ ওঠানোর মতো গলগল শব্দ করতে পারে। মা-বাবা এ সময় শিশুটির বধিরতার ব্যাপারে ধারণা করতে পারে না। কারণ শিশুটি অন্যভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। হঠাৎ সৃষ্ট ঝাঁঝালো শব্দ কিংবা সপাটে সাঁটানো দরজার কম্পন তাকে চমকে দেয়, যা দেখে তা অনুকরণেও সাড়া দিয়ে থাকে। মুখের অভিব্যক্তি, চারপাশের নড়াচড়া বুঝতে পারে, সেই হিসেবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে থাকে।

৬ মাস পর বধির শিশুর মুখে কথা ফোটার বিকাশ আর অগ্রসর হয় না। অনুকরণ করে শেখার প্রথম শর্তই হচ্ছে 'কথা শুনতে হবে' তাকে। বধিরতার কারণেই 'কথা শুনতে' পায় না, নিজের স্বরও কম ব্যবহার করতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি উচ্চারণের মাত্রা কমতে থাকে, আর কথা বলতে পারে না শিশুটি।

দ্রুত বধিরতা সনাক্ত করতে হবে

বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একজন সচেতন মা-ই শিশুর প্রাথমিক সমস্যাটি বুঝতে পারবেন সহজে। এর জন্য আলাদা ট্রেনিং-এর দরকার হয় না, প্রয়োজন শিশুর মৌলিক বিকাশের স্তর সম্বন্ধে সাধারণ বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ করা।

অল্প বয়সে 'বধিরতা' টের না পেলে শিশুটির বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, প্রাথমিক অবস্থায় সনাক্ত করা সম্ভব হলে যথাযথ ট্রেনিং এবং চিকিৎসার মাধ্যমে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়।

তিন বৎসর পর্যন্ত শব্দ শুনতে পায়নি এমন শিশুকে অতি ধীরে ধীরে নতুন শব্দ শেখানো যেতে পারে। কিন্তু সাত বৎসর ধরে সমস্যায় এক নাগাড়ে ভুগে থাকলে সমাধান প্রায় অসম্ভব হয়ে যেতে পারে।

মা-বাবাকেই প্রথমে সমস্যা সম্পর্কে চিকিৎসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। ৬ সপ্তাহে Starle Reflex-এর মাধ্যমে অনেক সময় বধিরতা সম্পর্কে আঁচ করা যায়। সুতরাং সামান্য হেরফের টের পেলে Reflex টি ব্যবহার করে দেখুন। দেখবেন, অল্পতেই আবার টেনশন করবেন না। আপনার ধৈর্যই শিশুর যাবতীয় উত্তরণের পথকে প্রশস্ত করবে।

কিছু উপদেশ

মুখে বোল ফোটার পূর্বেই শিশুটির সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করুন। চোখের সাথে চোখের সম্পর্ক (Eye to Eye contact) যতটুকু সম্ভব গড়ে তুলুন।

কণ্ঠস্বর থেকে নানা ঢংগে প্রকাশিত তথ্যগুলো বোঝার চেষ্টা করুন। শিশুটির মুখের অভিব্যক্তি, হাত-পা ছোঁড়া, খামছে ধরা, প্রভৃতি আচরণের মাধ্যমে কী প্রকাশ করছে, সূক্ষ্ম নজর রেখে বুঝে নিন; সেভাবেই সাড়া দিন।

আদর মেখে শিশুটির সাথে কথা বলুন। প্রথম দিকে মিষ্টি মধুর ধ্বনিই যথেষ্ট। ক্রমে ক্রমে যখন সে শব্দের প্রতি সচেতন হবে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ আওড়াবে। এ সময় শুদ্ধ শব্দটি তার সামনে উচ্চারণে করুন। মনে রাখবেন, শোনানোই আপনার কাজ, শেখানো নয়। বয়সের ধারা এবং বুদ্ধিমত্তার আলোকে আপনাকে অনুকরণ করে দক্ষ হয়ে উঠবে সে শব্দ চয়নে। অর্থপূর্ণ শব্দটি কেবল বাচনভঙ্গিই উন্নত করে না, শিশুটির মেধা এবং স্মরণশক্তির ভিত্‌কেও দৃঢ় করবে, করবে সমৃদ্ধ।

হড়বড় করে এটা ওটা নানা প্রশ্ন করবে শিশুটি, বিরক্তি দেখানো উচিত না। মেজাজ ঠিক রাখা দরকার। তার সাথে এ সময় একাত্ম হবার চেষ্টা করতে হবে। ব্যস্ততা থাকলে অতি কৌশলে এড়িয়ে আসুন, হঠাৎ করে ধমক দিয়ে তার আগ্রহে বাধার সৃষ্টি করবেন না।

বধিরতা সম্পর্ক সাধারণ কিছু জ্ঞান থাকা ভালো। সামান্য গলদ টের পেলেই অস্থির হবেন না, সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করুন শিশুটিকে। আপনাকেই সমস্যাটি ধরতে হবে আদি অবস্থায়, সিগনাল পেলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

স্মরণশক্তি ঃ যেভাবে বাড়ানো যায়

স্মরণশক্তি কীভাবে বাড়ানো যায়, কীভাবে সুসংহত করা যায়, বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার শেষ নেই।

বিজ্ঞান বলছে, মনের গভীর একাগ্রতাই স্মরণশক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, বুদ্ধিমত্তা বিকাশের ধারাকে সহজতর করে।

বুদ্ধিমত্তার সাথে জন্মগত বা জেনেটিক একটি বিষয় জড়িত আছে ঠিকই, এক্ষেত্রে পরিবেশের অবদানও কম নয়। সুন্দর পরিবেশ মনকে সতেজ করে, নানাভাবে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ধারাকে উদ্দীপ্ত করে।

খুব মনোযোগের সাথে যা শেখা হয়, স্মৃতির পাতায় তার ছাপ হয় দৃঢ়, ব্রেণের তথ্য লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি হয় দীর্ঘস্থায়ী। ফলে সহজেই 'অনেক পড়া' বা তথ্য দীর্ঘদিন মনে রাখা যায়।

• গবেষণার ফলে দেখা গেছে মনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীরাই ভালো রেজাল্ট করে।

গুরুজনরা বলে থাকেন, 'মন দিয়ে পড়, চোখ কান খোলা রেখে শেখো।'

এই বাক্যটি কেবল মাত্র গুরুজনদের সাদামাটা উপদেশ নয়, এখানেও লুকিয়ে আছে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানীরা সেই লুকোনো সত্যের সন্ধান পেয়েছেন।

মন কী ?

সাধারণত বুকের বাম দিকে আলতো করে হাত রাখি আমরা। বলি, এইতো, এখানে মন।

এটি সত্য নয়। এখানে আছে হৃৎপিন্ড বা হার্ট।

মন হচ্ছে ব্রেণের অংশ। আমাদের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি-আচরণ ও বুদ্ধিবৃত্তির সাথে এটি সম্পৃক্ত।

বিষয়বস্তুর ওপর মন নিমগ্ন করার অর্থ বা মনোযোগী হওয়ার মূল সূত্রই হচ্ছে শিক্ষণীয় 'পড়ার' সাথে ব্রেণের কার্যক্রমকে সুদৃঢ় বন্ধনে ধরে রাখা, চালিত করা।

স্মৃতির ভিত্‌কে দৃঢ় করতে চোখও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিজ্ঞানের যুগে অডিও-ভিডিও শব্দগুলোর সাথে আমাদের পরিচিতি দিন দিন বাড়ছেই।

কানে শোনা, চোখে দেখা। এই দেখা ও শোনার মাধ্যমে যদি মিল ঘটিয়ে কিছু শেখা যায়– দীর্ঘদিন মনে থাকে, স্মরণ করা যায় সহজে।

চোখের সঙ্গে ব্রেণের রয়েছে সরাসরি সংযোগ।

চোখ দৃশ্যমান বস্তুর ছবি ধারণ করে, ইমেজ সৃষ্টি করে। ইমেজকে বিশ্লেষণ করে ব্রেণ। প্রকৃত অর্থে বিশ্লেষণের কারণেই আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই।

গুরুজনরা আর একটি উপদেশ প্রায়ই দিয়ে থাকেন, 'খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া।'

উপদেশটি শুনতে শুনতে গা সওয়া হয়ে গেছে, তেমন পাত্তাই দিতে চাই না আমরা।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই উপদেশটিও বিজ্ঞানের মূল সূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। গুরুজনরাও হয়তো সেই সত্যটুকু জানেন না।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চাওয়া-পাওয়া, ব্যর্থতা, হতাশা বা বন্ধুদের সাথে ঝগড়া, কথা কাটাকাটি ইত্যাদি যদি সব সময় মনের ভেতর ঘুরঘুর করতে থাকে, ব্রেণ নতুন তথ্য সহজেই ধারণ করতে পারে না। তথ্যই যদি লিপিবদ্ধ না হয়, স্মরণশক্তি বাড়বে কীভাবে?

ফলে ক্লাসে পড়া বলতে গিয়ে আটকে যেতে হয়, পরীক্ষায় খাতায় লিখতে গিয়ে চুল টানতে ইচ্ছে করে। পরিণতিতে রেজাল্ট খারাপ.....বকাঝকা....জীবন যুদ্ধে আস্তে আস্তে সবার অজান্তে পিছিয়ে যাওয়া।

সবাই বলবে, ছেলেটির 'মেরিট' ভালো না, বুদ্ধি কম।

এই অপবাদের বোঝা সহজেই দূর করা যায়– টেবিলে পড়তে বসে যদি চারপাশের সব চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে বইয়ের সাথে মনকে আঁটকানো যায়, তবে শিখতে সময় লাগবে কম, স্মরণশক্তি হবে দীর্ঘস্থায়ী, বুদ্ধিমত্তা হবে শাণিত।

টিভি চ্যানেল স্টার-স্পোর্টস এর কারণে প্রতিদিনই আমরা টেনিস, ক্রিকেট, হকি ব্যাডমিন্টন, ফুটবল খেলা দেখছি।

অনেকেই ভালো ক্রিকেটার হতে চায়।

বিখ্যাত ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার বলেছেন, 'একজন দক্ষ ব্যাটসম্যান হতে হলে প্রতিটি বলের প্রতি মনের সূক্ষ্ম যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হবে, তীক্ষ্ণ চোখে বলটি পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।'

এই বাক্যটির ভেতরও কিন্তু বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে, লুকিয়ে আছে মন ও চোখ।

যে যতবেশি মনোযোগী হতে পারবে, কী খেলায়, কী পড়ায়, কী চিত্রাংকন প্রতিযোগীতায়, গানে কিংবা আবৃত্তিতে– সে তত বেশি সফল হবে, জয়ী হবে।

স্মৃতি শক্তি ধারালো রাখার কিছু কৌশল

উইলিয়াম জেমস নামক একজন বিজ্ঞানী বলেছেন, 'স্মৃতি হচ্ছে পেশীর মতো।' নিয়মিত ব্যায়াম করলে পেশী হয় সুদৃঢ়, পুরুষ্টু। স্মৃতিকেও তেমনি ধারালো ও সতেজ রাখা যায় নিয়মিত পরিচর্চার মাধ্যমে।

যা শেখা হচ্ছে, কেবল মাত্র গড়গড় করে মুখস্থ করে গেলেই চলবে না। একটু নেড়েচেড়ে দেখতে হবে কী শেখা হলো, দেখতে হবে যা পূর্বেই শেখা হয়েছে তার সাথে নতুন শিক্ষণীয় তথ্যের কোনো মিল আছে কিনা। এই প্রক্রিয়াটিকে ইংরেজিতে বলে Elaborative Rehearsal.

বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ধরা যাক শিখলাম, মৌলিক রঙ তিনটি– লাল, নীল, সবুজ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হয়তো শব্দ তিনটি মুখস্থ হয়ে গেল।

পরের দিন যদি প্রশ্ন করা হয়– মৌলিক রঙ কী কী ?

দেখা যাবে হয়তো লাল নীল সবুজের সাথে হলুদ, শাদা এসেও ভীড় জমাচ্ছে, উত্তর দেওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু যদি এভাবে শিখি অথবা শেখার সময় যদি এভাবে মনে মনে চিন্তা করি ঃ

লাল– সূর্যের রঙ লাল।

নীল– আকাশের রঙ নীল।

সবুজ– গাছ-গাছালির রঙ সবুজ।

এক্ষেত্রে এক মাস পরও যদি মৌলিক রঙ সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়, সহজেই উত্তর বেরিয়ে আসবে।

এখানে সূর্য, আকাশ, গাছ-গাছালি কিউ (Cue) হিসেবে কাজ করবে।

সূর্যের কথা মনে আসার সাথে সাথে লাল রঙের কথা ভেসে উঠবে চোখের সামনে, আকাশের দিকে চোখ পড়লে নীল রঙের কথা মনে পড়বে, গাছ-গাছালির দিকে তাকালে সবুজ রঙের কথা স্মরণ করা সহজতর হবে।

সঠিক সময়ের কাজ নির্দিষ্ট দিনেই করতে হবে।

আজকের পড়া আগামী দিনের জন্য জমিয়ে রাখা যাবে না।

প্রবাদ আছে, 'সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ে দশ ফোঁড়।'

খুবই সত্যি প্রবাদ এটি। একসাথে বেশি পড়া শিখতে গেলে স্মৃতির ভিত্ নড়বড়ে হয়ে যায়।

বারবার পড়তে হবে, জানা থাকলেও বারবার আবৃত্তি করতে হবে। 'মনে আছে' এমন বিষয় পর পর কয়েকবার রিহার্সেল দিতে পারলে স্মৃতির ভাণ্ডারে

স্থায়ী আসন পেতে বসে, সহজেই উড়ে যেতে পারে না, মগজের বিশেষ বিশেষ স্থানে গাঠনিক কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে, এই পরিবর্তন সুদূর প্রসারী ফল দেয়।

শেখার পর লেখার চর্চা করতে পারলে খুবই লাভ, অথবা লিখেলিখেও শেখার চেষ্টা করতে পারাটাও গুরুত্বপূর্ণ।

শেখা বিষয় থেকে প্রশ্ন তৈরি করে মনে মনে উত্তর আওড়াতে সময় ব্যয় করে খুবই ভালো ফলাফল করা যায়।

মনে রাখার আর একটি সহজ উপায় হচ্ছে ছন্দোবদ্ধ করে শেখা। আমরা ছড়া শিখি, গান শিখি, কবিতা শিখি। এক লাইন মনে আসার সাথে সাথে ছন্দের মিল থাকার কারণে পরবর্তী লাইনটিও সহজে মনে এসে যায়। ধাপে ধাপে জটিল বিষয় বস্তুকে যদি সুসংগঠিত (Organized) করে শেখা যায় অনায়াসে স্মরণ করা সম্ভব।

কিছু শেখার পর ঘুমোতে পারলে ভালো ফল পাওয়া যায়, শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তখন কোনো রকম ঝুট-ঝামেলা ছাড়াই আসন গেঁড়ে নিতে পারে স্মৃতির পাতায়।

সবার উপরে মন। থাকতে হবে মনের একাগ্রতা, অদম্য ইচ্ছা এবং দৃঢ়তা। তবেই স্মৃতির ভিত্ হবে উন্নততর, সমৃদ্ধও সমুজ্জল।

স্মৃতি

১.

পড়ার টেবিলটি খুবই সুন্দর।

সামনে শাদা দেয়াল, দেয়ালের ওপর ঝুলছে একটি রঙীন পোস্টার, সবুজ পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য, মাঝে মাঝে হলুদ ফুলের সমারোহ।

পাহাড়ের চারপাশ ঘিরে রয়েছে একটি লেক, স্বচ্ছ পানি। গাছগুলোর প্রতিচ্ছবি টলমল করছে পানির ভেতর, হলুদ ফুলগুলোও যেন মিটিমিটি করে হাসছে কেবল।

গতকালই টেবিলের সামনে পোস্টারটি ঝুলিয়ে দিয়েছে মা-মণি। মুগ্ধ চোখে এই অসাধারণ সুন্দর দৃশ্যটি দেখছে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র রুম্মান। মনটি যেন আনন্দে চমকে উঠছে। ভালো লাগছে, ভীষণ ভালো লাগছে।

মন ভালো থাকলে সুন্দর সুন্দর ইচ্ছে জাগে মনের ভেতর। রুম্মানেরও ইচ্ছে হলো একটি সুন্দর ছবি আঁকার।

ড্রয়িং বক্সটি টেনে নেয়, খাতাটিও নেয়।

হঠাৎই মনটি তেতো হয়ে উঠলো।

বেশ ক'দিন টেবিলে বসেনি সে, খেলা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ধূলো জমে আছে টেবিলে, বইয়ের ওপর। খাতাটি টেনে নেওয়ার সাথে সাথে কিছু ময়লা উড়তে থাকে, নাকেও ঢুকেছে, বিশ্রী একটা কাশি শুরু হয়েছে।

মুহূর্তের মাঝে ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে রুম্মান, চিৎকার করে ডাকতে থাকে, 'আকলিমা! এই আকলিমা!' আকলিমা কাজের মেয়ে, ছুটে আসে দ্রুত, সামনে দাঁড়ায়।

'টেবিলে এতো ময়লা কেন? রোজ পরিষ্কার করতে পারো না?'

'আপনিই তো টেবিলে হাত দিতে না করছেন।'

'কেন, না করবো কেন?'

'আমি কী জানি, কইছেন নিজের কাজ নিজে করবেন, আমি যেন হাত না দেই।'

হঠাৎই রাগ নিভে যায় রুম্মানের। কিছুটা লজ্জাও পেল। ঠিকই তো। সে-ই নিষেধ করেছিল, ভুলে গেছে কথাটি।

'আচ্ছা যাও।' আকলিমার দিকে তাকিয়ে নরম কণ্ঠে বললো সে।

নিজের টেবিল নিজে গোছানোর কাজে মন দেয় এবার। বাহ্! অল্প সময়েই টেবিলটি ঝকমক করছে যেন।

ক্লাস রুটিনটির ওপর একবার চোখ বুলোয়। চমকে ওঠে। আগামীকাল 'উড়াউড়া' ম্যাডামের ক্লাসে পড়া আছে। বাংলা পড়ান উঁনি। ভীষণ রাগ উঁনার। পড়া না পারলে কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ক্লাসে। আদরও করেন, তবে ভুল করলে ক্ষমা নেই। এ জন্যেই সবাই নাম দিয়েছে 'উড়াউড়া'।

পড়ার প্রতি মনস্থির করার চেষ্টা চালায় রুম্মান।

না, মন স্থির হচ্ছে না। হঠাৎ হঠাৎই মন চলে যাচ্ছে অন্যদিকে, খেলার মাঠে।

গতকালের খেলার দৃশ্যটি ভেসে উঠছে চোখের সামনে, বারবার।

ইন্টারক্লাস ক্রিকেট ফাইনাল, নবম শ্রেণীর সাথে খেলা চলছে, সে হচ্ছে দলের নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান, কিছু বোঝার আগেই তিন রানের মাথায় আউট হয়ে গেল।

লেগ স্টাম্পের বাইরের একটি বল, বাঁক খেয়ে সাঁই করে ভেতরে ঢুকে গেল, স্টাম উড়ে গেছে, বোল্ড আউট।

কিছুতেই দৃশ্যটি চোখের সামনে থেকে সরাতে পারছে না, কিছুক্ষণ পরপরই বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস বের হচ্ছে।

'উড়াউড়া' ম্যাডামের কড়া চোখও ভেসে উঠছে, পড়তে থাকে আবার, আধ ঘণ্টার পড়া মুখস্থ করতে সময় লাগলো প্রায় দু'ঘণ্টা।

২.

পরের দিনের ঘটনা।

বাংলা ক্লাস চলছে, লাইন ধরে ম্যাডাম সবাইকে পড়া জিজ্ঞেস করছেন, দু'জন ইতিমধ্যে ভুল করেছে, কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

এবার রুম্মানের পালা।

একি! সে ঠিকমতো বলতে পারছে না কেন ! দু'লাইন বলার পরই ঠেকে গেছে, মাথা চুলকাতে শুরু করেছে।

ম্যাডাম যেন হোঁচট খেলেন। কারণ রুম্মান সবসময় পড়া শিখে আসে, ত ক পারছে না কেন!

সবার জন্য একই সাজা, বাতিল করার উপায় নেই, ক্ষুব্ধ চোখে তিনি রুম্মানের দিকে তাকালেন, 'কান ধরো! ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকো।'

চোখ লাল হয়ে উঠেছে, যেন শুকিয়ে গেছে চোখ, একটুও পানি বের হচ্ছে না। কানও গরম হয়ে উঠছে। আদেশ অমান্য করার উপায় নেই। দু'হাতে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকলো সে।

ব্যাখ্যা

রুম্মান ভালো ছাত্র, মেরিট ভালো ওর, আগের পরীক্ষাগুলোই স্বীকৃতি বহন করছে।

কিন্তু মেরিট কী, কেনইবা আজ পড়ার পরও উত্তর দিতে পারলো না ? স্মরণশক্তি কি কমে যাচ্ছে ? বুদ্ধিমত্তা কি হ্রাস পাচ্ছে ওর ?

বিজ্ঞান বলছে, মনের গভীর একাগ্রতাই স্মরণশক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বুদ্ধিমত্তা বিকাশের পথকে সহজতর করা যায় একান্ত নিমগ্নতার মাধ্যমে বিষয়বস্তু শেখার মধ্য দিয়ে।

বুদ্ধিমত্তার সাথে জন্মগত বা জেনেটিক একটি বিষয় জড়িত আছে ঠিকই, পরিবেশের অবদানও অনেক বেশি, সুন্দর পরিবেশ মনকে সতেজ করে, নানাভাবে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খুব মনোযোগের সাথে যা শেখা হয়, স্মৃতির পাতায় তার ছাপ হয় দৃঢ়, ব্রেণের তথ্য লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি হয় দীর্ঘস্থায়ী। ফলে সহজে 'অনেক পড়া' বা 'তথ্য' দীর্ঘদিন মনে রাখা যায়। গবেষণার ফলে দেখা গেছে, মনোযোগী ছাত্র-ছাত্রীরাই ভালো রেজাল্ট করে।

গুরুজনরা বলে থাকেন, মন দিয়ে পড়ো। চোখ কান খোলা রেখে শেখো। এই বাক্যটিকে এখন কেবলমাত্র গুরুজনদের শাদামাটা উপদেশ ভেবে নিলে চলবে না। মনে রাখতে হবে উপদেশটির ভেতর লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সঠিক তথ্য।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে মন কী ?

সাধারণত বুকের বামদিকে আমরা আলতো করে হাত রেখে বলি, 'এই তো এখানে মন।'

না, এটি সত্য নয়। এখানে আছে হৃৎপিণ্ড বা হার্ট।

মন হচ্ছে ব্রেণের অংশ, যা আমাদের চিন্তা-চেতনা অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত।

বিষয় বস্তুর ওপর মন নিমগ্ন করার অর্থ ব্রেণের কার্যক্রমকে গভীরভাবে চালিত করা; চিন্তা-চেতনা-অনুভূতিকে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সাথে একাত্ম করে টেনে নেওয়া।

স্মৃতির ভিত্‌কে দৃঢ় করতে চোখও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বিজ্ঞানের যুগে অডিও-ভিডিও শব্দগুলোর সাথে আমরা পরিচিত।

কানে শোনা, চোখে দেখা এবং দেখা ও শোনার মাধ্যমে মিল ঘটিয়ে যদি কিছু শেখা যায় দীর্ঘদিন মনে থাকে, স্মরণ করা যায় সহজে।

চোখের সাথে ব্রেণের রয়েছে সরাসরি সংযোগ। চোখ দৃশ্যমান বস্তুর ইমেজ সৃষ্টি করে, ইমেজকে বিশ্লেষণ করে ব্রেণ। প্রকৃত অর্থে বিশ্লেষণের কারণেই আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই।

রুম্মান সুন্দর পাহাড়ের ছবি দেখেছিল, দেখে মন কিছুটা ভালো হয়, সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহিত হয়।

টেবিলের ধূলোময়লা মনকে তেতো করে তুলেছিল, ক্ষুদ্ধ হয় সে। সৃষ্টিশীল কাজ থেকে দূরে সরে আসে।

ক্লাসের পড়াশেখার প্রতিও ইচ্ছের অভাব ছিল না রুম্মানের। কিন্তু খেলার মাঠের ব্যর্থতা পড়ার টেবিলেও তাড়া করছিল, মনোযোগ ধরে রাখতে পারছিল না, যা শিখেছিল স্মৃতির পাতায় স্থায়ী আসন পায়নি, ফলে ক্লাসেও ব্যর্থ হয়েছে সে।

গুরুজনরা আর একটি উপদেশ প্রায় দিনে থাকেন, 'খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া।'

এই উপদেশটিও স্মরণশক্তি বিষয়ক বিজ্ঞানের মূল সূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চাওয়া, পাওয়া, ব্যর্থতা, হতাশা যদি সব সময় মনের ভেতর ঘুরঘুর করতে থাকে, ব্রেণ নতুন তথ্য সহজে ধারণ করতে পারে না, ফলে স্মরণশক্তি কমতে বাধ্য।

টেবিলে পড়তে বসে যদি সব চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে বইয়ের সাথে মনকে আঁটকানো যায়, তবে শিখতে সময় লাগবে কম, স্মরণশক্তি হবে দীর্ঘস্থায়ী।

'একজন দক্ষ ব্যাটসম্যান হতে হলে প্রতিটি বলের প্রতি মনের সূক্ষ্ম যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হবে, তীক্ষ্ণচোখে বলটি পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।' কথাগুলো বলেছেন বিখ্যাত ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকার।

এই বাক্যটির ভেতরও কিন্তু বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে, লুকিয়ে আছে মন ও চোখ। যে যতবেশি এসব মনের গোপন ক্রিয়াগুলো ধারালো করতে পারবে, সে সকল ক্ষেত্রেই জয়ী হবে।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও করণীয়

আপনার শিশু কেন খেতে চায় না

১.

জিদনির বয়স এক বছর। খাচ্ছে না সে, হামাগুড়ি দিয়ে ছুটোছুটি করছে মেঝেয়। মুখে বিরক্তির চিহ্ন নেই, কান্নার আভাস নেই, দুষ্টমি ভরা অভিব্যক্তি।

জিদনির মা চাকরি করেন, অফিসের সময় হয়ে গেছে, বাচ্চাকে না খাওয়াতে পারলে অফিসে স্বস্তি পাবেন না, তাই ঘুরছেন ওর পিছে পিছে। হাতে বাটি, বাটিতে মজাদার সব খাওয়া। না, জিদনির সেদিকে নজর নেই।

এবার বাবার পালা। তিনিও হামাগুড়ি দিয়ে ছুটছেন একমাত্র সন্তানের সাথে। চান্স পাওয়া গেলেই ওকে খাইয়ে দেবেন। না, চান্স পাওয়া গেল না। এক সময় তিনি ও ক্লান্ত হয়ে দমে গেলেন।

২.

রিশাদের সংগ্রহ হয়েছে তিনশ' খেলনা গাড়ি।

দুই বৎসর বয়স তার। খাওয়ার প্রতি আগ্রহ নেই। মা-বাবা শংকিত। অফিস থেকে ফেরার পথে কিংবা বাহির থেকে ঘরে ফিরলে সাথে একটা করে খেলনা গাড়ি নিয়ে আসতে হয়।

খাওয়ার সময় রিশাদের প্রয়োজন একটি গাড়ি, পুরনো নয়— নতুন। নতুন গাড়ি পেলেই সে খেতে শুরু করে। এভাবেই নতুন গাড়ি সংগ্রহের পরিমাণ তার বেড়েই চলেছে।

ব্যাখ্যা

জিদনি এবং রিশাদ খেতে চায় না।

কেন ?

তাদের স্বাস্থ্যও খারাপ না। বৃদ্ধি এবং বিকাশে কোনো খাটতি নেই। তবে গলদ কোথায় ? ওদের মা-বাবার আর্থিক অবস্থাও ভালো। সাধারণত এ ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে নয় মাস থেকে চার বৎসরের শিশুদের মধ্যে। নানা কারণে এমনটি ঘটে থাকে। যেমন—

এ বয়সে শিশুরা সাধারণত কিছুটা অস্থির স্বভাবের হয়, এটা সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সব কাজেই রয়েছে নতুনকে জানার আগ্রহ, বাড়াবাড়ি ত্রস্তব্যস্ততাও তার এক ধরনের নেশা এবং খেলা।

এ বয়সেই তারা সবার নজর কাড়তে চায়, নিজেকে সবার মধ্যমণি ভাবতে ভালোবাসে, নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং চায় সবার আদর ও ভালোবাসা।

একটি পর্যায়ে আসার পর শিশুর দ্রুত বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে আসে। ফলে মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়ে, শিশু বাড়ছে না এই চিন্তায় তার দৈনন্দিন সুখ হারাম হয়ে যায়। ফলে বেশি বেশি যখন তখন খায়ানোর জন্য তিনি নিজের অজান্তেই প্রায় সারাক্ষণ সন্তানের পিছে লেগে থাকেন।

কোনো কিছুতেই সহযোগিতা পাওয়া যায় না। ফলে মা-বাবা আত্মীয় স্বজন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, ভাবেন শিশুটি দিন দিন বেয়াড়া হচ্ছে।

শিশুরা খাওয়ার সময় কালক্ষেপণ করে, খাওয়া নিয়ে খেলতে ভালোবাসে। ফলে তীব্র ক্ষুধা না পেলে খাওয়া পেলেই মুখে পুরে দেবে না। তাদের সময় জ্ঞান থাকে না, সুতরাং খাওয়া শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।

সব শিশুর খাওয়ার রুচি এক রকম নয়, তারতম্য আছে। যারা বাহিরে ছুটোছুটি করে, খেলাধুলা করে, তাদের ক্ষুধার পরিমাণ বেশি। যারা সব সময় ঘরে থাকে, বসে বসে টিভি দেখে, শারীরিক ছুটোছুটিতে অভ্যস্ত নয়, তাদের ক্ষুধা কম, খাওয়ার পরিমাণও কম।

৩.

ছোট্ট মেয়ে তৃণা। বেডরুমে খেলছিল, হঠাৎ খেলা থামিয়ে দেয়, আগ্রহ হারিয়ে ফেলে খেলার প্রতি। একটু পরই আঙুল চোষা শুরু করে। না, তাতেও স্বস্তি নেই। কান্না শুরু করে এবার।

তৃণার মা ছুটে আসেন। কোলে নেন, আদর করেন। 'না, না, কেঁদো না' বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। কিছুতেই থামছে না তৃণা, হাত-পা ছুঁড়তে থাকে এবার।

কাঁদছে কেন মেয়েটি ?

হঠাৎই খেয়াল হলো এখন প্রায় দুপুর একটা, সকালের নাস্তার পর আর খাওয়া দেওয়া হয়নি ওকে। তবে কি তার খিদে পেয়েছে ?

দ্রুত তিনি ছুটে যান রান্না ঘরে, প্লেটে নিয়ে এলেন খিচুরি খিচুরি তৃণার খুব প্রিয়।

তৃণা এখন খিচুরী খাচ্ছে, শান্ত। কান্না থেমে গেছে, খাওয়া শেষে এক সময় শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে।

ব্যাখ্যা

তৃণার ভেতর কী ঘটেছিল, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী ?

তৃণার খিদে পেয়েছিল, ক্ষুধা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ড্রাইভ (Drive)।

ড্রাইভের কারণেই কান্নার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে অর্থাৎ কান্নার মোটিভ (Motive) হচ্ছে ক্ষুধা।

সে খেলা বন্ধ করে দিয়েছিল, বন্ধ করে কেঁদেছে, হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করেছে, আচরণগত পরিবর্তন সাধিত হয় (Motivated behabior)।

যতোক্ষণ খিচুরি পায়নি, ততক্ষণ কেঁদেছিল। খাদ্য ছিল তার লক্ষ্য বস্তু (Goal)।

তৃপ্তি সহকারে খিচুরি খেয়েছে সে (Goal achievement)।

ক্ষুধাবৃত্তি নিবারণের কারণেই কান্না থেমে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে তৃণা (Drive reduction)।

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে মানব মনের স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তিগত ইচ্ছের জন্ম, বিস্তার বা তাড়না এবং সফল পরিণতির বৈজ্ঞানিক সূত্রটি তুলে ধরা হয়েছে।

জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া সফলতা/ব্যর্থতা এই সূত্রের আলোকেই চালিত হয়।

এক্ষেত্রে আমরা দেখছি খিদে পেয়েছে বলেই তৃণার খাওয়ার প্রতি আগ্রহ জেগেছে। যখন তখন এটা সেটা খাওয়ালে শিশুদের ভেতরগত এই ড্রাইভ স্বাভাবিক থাকে না, ফলে খাওয়ার প্রতি তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

শিশুকে অবশ্যই ব্যালেন্স ডায়েট দিতে হবে এবং খাওয়ার সঠিক সময় (Appropriate meal time) এর প্রতিও মা বাবাকে সজাগ থাকতে হবে। খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কিছু উপদেশ

জিদনি, রিশাদ ও তৃণার মা-বাবার প্রতি নিচের উপদেশগুলো প্রযোজ্য ঃ

১। জিদনি, রিশাদ এবং তৃণার ক্ষুধা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। মূল সমস্যা মায়েদের মাঝে। শিশুর প্রতি অতিমাত্রায় সচেতনতা আপনাদের স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনাকে হার মানিয়ে দিয়েছে।

২। যখন খেতে দেবেন, নজর রাখবেন না তার দিকে। সে কী খাচ্ছে, না খেলছে খেয়াল করার দরকার নেই। অনেক মা আছেন শিশুর প্লেটের দিকে শৈন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন, খাওয়ানোর জন্য চামচ ব্যবহার করেন, চাপাচাপি করেন। কখনই এমনটি করা উচিত নয়। শিশুর সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।

৩। খাওয়ার সময় যেসব শিশুরা খেতে চায় না, তাদের দুই বেলা খাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে এটা সেটা খেতে দেবেন না।

৪। স্বাস্থ্যবান ও নিরোগ শিশুরা খিদে পেলে নিজের তাগিদেই, নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবে। একাকী খাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে দিন। নিজের হাতে খাওয়ানোর ভার তুলে নেওয়া উচিত নয়।

আপনার শিশুর মুখে হাসি ফুটুক এবং সুস্থ ও সুন্দর থাকুক।

উপসংহার

যে সব শিশুর খাওয়া পড়া, যাবতীয় কাজের দায়িত্ব মায়ের হাতে থাকে, তারা ক্রমে ব্যক্তিত্বের দিক থেকে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গড়ে ওঠে, (Dependent Personality)। নিজের 'ইচ্ছে' আকাঙ্খা, বা ড্রাইভকে লক্ষ্য পথে এগিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে কষ্টকর, ফলে মেধার বিকাশ স্বতস্ফুর্ত সহজ গতি হারিয়ে ফেলে।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও করণীয়

আপনার শিশু স্কুলে যেতে চায় না কেন

ভোরের কাঁচা সূর্য পূর্বাকাশে উঁকি দিচ্ছে। জানালার ফাঁক দিয়ে সরু আলোক রেখা রুমে ঢুকেছে।

মা ডাকছেন। উঠতে হবে, স্কুলে যেতে হবে। তবুও চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না। অনিচ্ছা সত্ত্বে চোখ মেলে তাকালো সজীব।

উহ্! স্কুলের কথা মনে হলেই যেন শরীর অবশ হয়ে আসে, ঝিঁঝিঁ করে মাথা, ঝিনঝিন অবসন্নতা যেন চেপে ধরে চলনশক্তি। হঠাৎ করেই শুরু হয়েছে সমস্যাটি– স্কুলের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়েছে, যেন স্কুল থেকে দূরে থাকতে পারলেই রক্ষা। স্কুলে যাওয়ার সময় যতই এগুতে থাকে, বুকের ধড়ফরানিও বেড়ে যায়। বমিবমি লাগে, মাথা ঘুরায়, পেট ব্যথা কিংবা শরীরে ম্যাজম্যাজ অনুভূতি জেগে ওঠে। মজার ব্যাপার হলো স্কুল বন্ধের দিন এসব সমস্যা থাকেই না।

কখনো কখনো স্কুলে যেতে অস্বীকৃতি জানায় সজীব, বেঁকে বসে। কখনো রওনা হয় বাসা থেকে, স্কুলে পৌঁছার আগেই ফিরে আসে। আবার কখনো হয়তো স্কুলে গিয়ে হাজির হয়েছে, কিছুক্ষণ পরই চলে এলো বাসায়। জোর করলেই নানা অজুহাত দেখাবে সে– কখনো বাসা থেকে বেরুতেই ভয়ের কথা বলবে, কখনো বলবে পথ চলার ভীতির কথা, অথবা স্কুলেরই নানা ভয়ের ব্যাখ্যা দাঁড় করাবে। তাই জোরাজুরি করলেই ক্ষেপে উঠবে, হয়তো কান্না শুরু করে দেবে, অথবা শারীরিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, অনড় প্রতিরোধ। নিত্যই ঘটছে এমন, তবে স্কুল না যাওয়ার কথা গোপন রাখে না সে। মা-বাবাও নিশ্চিত স্কুলে না গেলেও আশেপাশে নিরাপদে কোথাও আছে সজীব।

কেন এমন ঘটছে

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, 'স্কুলে যাওয়ার অনীহা' এককভাবে কোনো মানসিক রোগ নয়, বলা যায় এটি এক ধরনের আচরণ যার পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে অনেক কারণ।

বয়সের কয়েকটি স্তরে স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে অনীহা জাগতে পারে ঃ

৫ থেকে ৭ বৎসর ঃ স্কুল জীবনের শুরু থেকে।

১১ বা প্রায় ১১ বৎসর ঃ যখন একটি শিশু প্রাইমারী থেকে সেকেণ্ডারি স্কুলে প্রবেশ করে।

টীন এজের শুরু কিংবা ১৪ বৎসর থেকে।

অপেক্ষাকৃত কম বয়সের বাচ্চাদের সাধারণত হঠাৎ করেই শুরু হতে পারে সমস্যাটি। বয়োসন্ধিক্ষণে শুরু হয় ধীরে ধীরে বন্ধুদের সাথে মেলামেশা, খেলাধূলা, হৈচৈ কমিয়ে দেবে ছেলে বা মেয়েটি। পূর্বে এমনটি ছিল না সে, বরঞ্চ আনন্দপূর্ণ আচরণই ছিল তার চরিত্রের মূলধারা।

সাধারণত শিক্ষকের পরিবর্তন, বাড়ি বদল, বন্ধু হারানো কিংবা শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি ঘটনাগুলো সমস্যাটি উস্‌কে দিতে পারে। দীর্ঘদিন ছুটির কারণে স্কুলে যাওয়া হয় না, অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণেও অনেক সময় টানা অনুপস্থিত থাকতে হয়। এমনি পরিস্থিতিতে স্কুল যাওয়ার দিনই অনীহা জাগতে পারে, অথবা আগে ছিল এমন সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

দাদা-দাদীর সাথে একটি শিশুর নিবিড় বন্ধন গড়ে ওঠে। অনেক সময় দেখা যায়, এঁদের কারও অসুস্থতা থাকলে শিশুটি স্কুলে যেতে চায় না। এমনও হতে পারে কোনো কোনো মা ইচ্ছেকৃত ভাবেই সন্তানটিকে স্কুলে না যাওয়ার ব্যাপারে ইন্ধন দিয়ে থাকেন নিজের অজান্তেই। হয়তোবা অবচেতন ভাবেই শিশুটির সান্নিধ্য কামনা করেন ভিতরে ভিতরে, অথবা ভাবেন স্কুলে যাওয়া অর্থহীন, কিংবা শিশুটি দূরে দূরে থাকুক– এটি মেনে নিতে পারেন না।

অপেক্ষাকৃত কম বয়সের শিশুর স্কুলে না যাওয়ার পিছনে লুকিয়ে থাকে 'সেপারেশন অ্যাংজাইটি ডিসওর্ডার'। যেমনটি ঘটেছে সজীবের ক্ষেত্রে। মাত্র ৮ বৎসর বয়স ওর। বাবার সাথে আছে নিবিড় বন্ধন। বাবা সরকারী কর্মকর্তা, বদলি হয়েছেন কক্সবাজার। বাবা চলে যাওয়ার পরই সজীবের ভেতর স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে অনীহা শুরু হয়ে গেছে, অথচ এমনটি আগে কখনো ছিল না।

বয়স্ক শিশুদের স্কুলে যেতে না চাওয়ার কারণগুলো হলো ঃ

স্কুল ফোবিয়া বা স্কুল ভীতি, যাওয়া-আসার পথের সমস্যা, অন্য দুরন্ত শিশুদের দ্বারা অত্যাচারিত, পীড়িত বা সমালোচিত হওয়া, আশানুরূপ ফলাফলের ব্যর্থতা।

টীন এজারদের স্কুলে না যাওয়ার সাথে জড়িত থাকে বিষণ্নতা বা ডিপ্রেশন।

স্কুলের প্রতি অনীহার সাথে সাইকোসিস বা বড় ধরনের মানসিক রোগের সংশ্লিষ্টতার তেমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

স্কুল পালানো শিশু আর স্কুলে যেতে চায় না এমন একটি শিশুর মাঝে রয়েছে সুস্পষ্ট সীমারেখা।

পালানো শিশুর মা বাবা জানেন না যে সন্তান স্কুলে যায়নি; স্কুলে যাওয়ার নাম করে বের হয় সে, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, সিনেমায় যায়, বাজে ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয়, ছুটির সময় হলে বাসায় ফিরে আসে অথবা ফিরতে দেরি করে। এসব শিশুর পরীক্ষার ফলাফল খারাপ থাকে– 'কন্ডাক্ট ডিসওর্ডার'ই অন্তর্নিহিত মূল কারণ। পারিবারিক সমস্যা যেমন– মা-বাবার দাম্পত্য কলহ, দুষ্কর্ম, বড় পরিবার, আর্থিক অনটন, দেখাশোনার নিয়মানুবর্তিতার অভাব, স্কুল পালানো মনোভাব গড়ে তুলতে পারে একটি শিশুর ভিতর, এর চিকিৎসা পদ্ধতিও ভিন্নতর।

পক্ষান্তরে স্কুলে যেতে চায় না এমন শিশুর পূর্বের পরীক্ষার ফলাফল ভালোই থাকে, ধীরে ধীরে রেজাল্ট খারাপ হতে থাকে– সমস্যাটির সাথে জড়িত থাকে নিউরোটিক ও Over protective পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, 'ইমোশনাল ডিসওর্ডার'।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

১. দ্রুত স্কুলে ফেরত পাঠাতে হবে শিশুটিকে (Back to School Approach) ঃ হঠাৎ করে শুরু হওয়া সমস্যাটি দীর্ঘায়িত হওয়ার আগেই এই ব্যবস্থা নিতে হবে, পুরো স্কুল পিরিয়ডই শিশুটিকে স্কুলে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, মা ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে স্কুলে পাঠাতে পারলে ভালো ফল দেবে, শিশুটির মঙ্গলের জন্যই দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে। মা-বাবাকে এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া যাবে না, মা-বাবার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং শিক্ষকের সমর্থন, সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষকদের উচিত হবে স্কুলে পড়া ধরা কিংবা বাড়ির কাজ থেকে কিছুদিনের জন্য ছাত্র বা ছাত্রীটিকে রেহাই দেওয়া, মমতা দিয়ে ধীরে ধীরে স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলার সাথে তাকে একাত্ম করে নিতে হবে, স্কুলে অন্য ছাত্র-ছাত্রীর দ্বারা নাজেহাল হওয়ার ঘটনা থাকলে, উদ্‌ঘাটন করতে হবে এবং ব্যবস্থা নিতে হবে শিক্ষককে। যাওয়া আসার পথে কোনো সমস্যা আছে কিনা খুঁজে দেখতে হবে মা-বাবাকে।

২. যদি সমস্যাটি ইতিমধ্যেই দীর্ঘায়িত হয়ে যায়, ধীরে ধীরে স্কুলের প্রতি সন্তানটিকে আগ্রহী করে তুলতে হবে (Gradual Desensitisation Approach) ঃ প্রথম প্রথম স্কুল থেকে ঘুরিয়ে আনতে হবে, ক্রমান্বয়ে এক ঘণ্টা.... দুই ঘণ্টা.....তিন ঘণ্টা.....এভাবে স্কুলে অবস্থানের সময় বাড়াতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে একই ক্লাসের অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে টিউটোরিয়াল ক্লাসের আয়োজন করে সমস্যায় আক্রান্ত শিশুটির অনীহা কমিয়ে আনা যায়, স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব।

স্কুল বদলানোর প্রয়োজন হতে পারে অনেক সময়। অ্যাংজাইটি তীব্রতর হলে হাসপাতালেও ভর্তির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তবে এমন ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনা কমই থাকে।

৩. পারিবারিক থেরাপী (Family Approach) ঃ শিশুর প্রতিটি কাজে, গতিবিধিতে মা-বাবার ভূমিকা কমিয়ে আনতে হবে। সন্তানের এই অনীহাকে কোনো অজুহাতেই ছাড় দেওয়া যাবে না, সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে স্কুলে ফেরার ব্যাপারে। এক্ষেত্রে বাবা-মার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ফলাফল

দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে সফলতা আসে।

যদি শিশুটির বয়স থাকে কম, সমস্যাটি যদি হঠাৎই শুরু হয়ে থাকে, সমাধানের পদক্ষেপ যদি নেওয়া হয় দ্রুত, ফলাফল আশাব্যাঞ্জক।

স্কুলে ফেরানো গেলেও আবেগীয় ও সম্পর্কজনিত সমস্যা সাধারণত থেকেই যায়। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধতায় আটকে যায়, এক-তৃতীয়াংশ নিউরোটিক ডিসওর্ডারে ভুগে থাকে। খুবই কম সংখ্যকের মধ্যে বাইরে যাওয়ার ভীতি কিংবা কাজ করার অনীহা জাগতে পারে।

দ্রুত সমস্যায় সমাধান করা সম্ভব না হলে শিশুটি ক্রমান্বয়ে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ, একাগ্রতা হারিয়ে ফেলতে পারে, স্মরণশক্তির ভিত্ নড়বড়ে হয়ে যাবে, মেধার বিকাশও মুখ থুবড়ে পড়বে। ফলে একটি সম্ভাবনাময় মেধাবী ছাত্রের সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

কোথায় পাবেন চিকিৎসা সেবা

মনোরোগ চিকিৎসকরা কেবলমাত্র উন্মাদগ্রস্ত রোগীরই চিকিৎসা করেন না, অনেক শারীরিক রোগেরও চিকিৎসা করেন যার উৎপত্তিস্থল মন, এসব সমস্যার দেহগত কোনো ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় না। আবেগীয় সমস্যা, বৃদ্ধি ও বিকাশের সমস্যাসহ নানা মনোজাত সমস্যা মোকাবেলায় আপনার শিশুটিকে নিয়ে হাজির হতে পারেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞর নিকট। কেবল প্রয়োজন আপনার সচেতনতা, কুসংস্কারের বেড়াজাল টপকিয়ে দ্রুত শিশুর মঙ্গলের জন্য এগিয়ে আসা জরুরী। শিশুর বুদ্ধিবিকাশের পথে কোনো বাঁধা থাকলে দূর করা যায়, বৈজ্ঞানিকভাবেই সন্তানের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথটি মসৃণ করা যায় সহজে।

শিশুর বিষণ্ণতা রোগ ঃ পারিবারিক প্রেক্ষাপট

১.

ঝলমলে রোদ ক্রমশ বাড়ছে, দিনের তেজ বাড়ছে, বাইরে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সৌরভ, হঠাৎই জানালাটি ঠাস করে সেঁটে দিলো। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, শাঁ শাঁ আওয়াজ হচ্ছে, একবার ওপরের দিকে তাকালো, বিরক্তই হলো, ফ্যান অফ করার জন্য সুইচবোর্ডের দিকে হাত বাড়ায়, থমকে যায় আবার, বন্ধ না করে ফিরে আসে টেবিলে। টেবিল এলোমেলো, ছড়ানো ছিটানো বই খাতা– কতক্ষণ তাকিয়ে থাকলো টেবিলের দিকে, হঠাৎ একটি বই তুলে নেয় হাতে, কয়েক পৃষ্ঠা ওল্টায়, তারপরই আচমকা ছুঁড়ে মারে খাটের দিকে।

কাজের বুয়া জরিনা। ট্রে হাতে এগিয়ে আসে। ট্রেতে পরোটা, ডিম মামলেট, গ্লাস ভর্তি পানি। ডিম মামলেট সৌরভের খুব প্রিয়, সকালের নাস্তায় এটি থাকতেই হবে। আস্তে করে টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখলো জরিনা। ঘাড় শক্ত করে কটমট ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে সৌরভ। ভয় পায় না জরিনা, কারণও বুঝে না, ট্রে রেখেই ফিরে যেতে ঘুরে দাঁড়ায়।

'খাবো না, নিয়ে যাও।' কড়া ভঙ্গিতেই বললো সৌরভ।

জরিনা হতভম্ব। সৌরভের মেজাজ বুঝে চলতে অভ্যস্ত সে কিন্তু মুস্কিল হলো ইদানিং ওর অন্যরকম আচরণ মোকাবেলা করতে পারছে না যেন।

তবুও বললো, 'কী খাইবেন ?'

'কিছু না, নিয়ে যাও সব।' ধমক দিয়ে আদেশ করলো সৌরভ।

'খালাম্মা খাইতে কইছে।' বলেই ধমক অগ্রাহ্য করে হাঁটা দেয় জরিনা।

মুহূর্তেই গ্লাসটি তুলে নেয় হাতে, ছুঁড়ে মারে দেয়ালে, ঠাস করে বিকট এক শব্দ হয়, গ্লাস ভেঙ্গে চৌচির, গট করে এবার উঠে দাঁড়ায় সৌরভ, ধপাস করে শুয়ে পড়ে বিছানায়। জরিনা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে মেঝের দিকে।

২.

শরীর ভালো লাগছে না, কেমন যেন অস্থিরতায় ভুগছেন হাফিজুর রহমান, সৌরভের বাবা। সাধারণত বের হন খুব সকালে, ফিরেন রাত করে, প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি করেন তিনি। আজ পাঁচটার আগেই ফিরেছেন।

বিকেলটি বেশ পরিচ্ছন্ন, কোমল বাতাস বইছে, রোদের তেজও কমে এসেছে। ঘরে ঢুকেই হোঁচট খেলেন। সব রুমের জানালা বন্ধ, বাইরের দরজাটিই কেবল খোলা। বেডরুমে উঁকি দিলেন– খালি রুম, সৌরভের মা শিরিন বানু বাসায় কি নেই! এখনো ফেরেনি! চট করে যেন মাথায় জমাট বাধা শুরু হলো, রুমে ঢুকলেন না। ছেলের রুমেও উঁকি দিলেন একবার– চুপচাপ বসে আছে সৌরভ, একা একা। ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে, কেমন যেন অন্যরকম লাগলো ওকে।

এবার রান্না ঘরে এলেন তিনি। জরিনা কাজ করছে, দেখেই উঠে দাঁড়ায় সে।

'সৌরভ বিকেলে খেলতে যায় না?' জরিনাকে জিজ্ঞেস করলেন হাফিজুর রহমান।

'না, কয়দিন অইলো ঘরেই বইয়া থাহে, খেইলতে যায় না, খায়ও না।'

'একদম খায় না ?'

'মাঝে মাঝে খায়, কম কম।'

'স্কুলে যায় ?'

'মাঝে মাঝে যায়, আবার তাড়াতাড়িই ফিইরা আহে।'

'অসুখ করে নি তো ?'

'মনে অয় না, খালিখালি মেজাজ দেহায়। খিটির মিটির করে, পইড়তেও বহে না ?'

'তোর খালাম্মা কখন বের হয়েছে ?'

'সহাল সাড়ে নয়টায়।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন হাফিজুর রহমান, জুতা খুলেই শার্ট প্যান্ট নিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ছেলের জন্য মায়া হচ্ছে, টের পাচ্ছেন। উঠে গিয়ে যে আদর করবেন, তাগিদ বোধ করছেন ঠিকই, উঠতে পারছেন না, এক ধরনের জড়তা যেন গ্রাস করেছে নিজের শক্তি।

শিরিনের কথা মনে হতেই মনটি তেতো হয়ে উঠলো, রোজই কি দেরি করে ফেরে ? তারা কি পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন ? আজকাল তো

কথাই হয় না, বিছানায় থাকেন উভয়ে জড় পদার্থের মতো, ভালোবাসা কি হারিয়ে গেছে ? নিজেকে অনুভব করার চেষ্টা করেন তিনি, না, হারাইনি তো। মায়া বোধ তো আছেই, তবে শরীর টানে না কেন ? উভয়েরই কি একই অবস্থা ? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নগুলো ঢুকছে মনে, প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এলোমেলো।

গেইটের বাইরে গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ টের পেলেন তিনি।

কে এলো ? শিরিনই কি ?

হ্যাঁ, তাই তো! আজকাল তাহলে গাড়িতেই আসা যাওয়া করে ?

চিন্তার সূতো ছিঁড়ে যায়। শিরিন ঘরে ঢুকছে, হাতে ব্যাগ, পরিপাটি শাড়ি পরনে, মুখে প্রসাধনের প্রলেপ স্পষ্ট। যেন ঝলমল করছে, যেন লাবণ্য আরো বেড়ে গেছে, অনেক দিন তো খেয়ালই করে দেখা হয়নি।

একটু যেন হোঁচট খেলো শিরিন, এ সময় স্বামীটি কখনো বাসায় ফেরে না। পরক্ষণেই সহজ হয় সে, কাছে গিয়ে বসে।

'দেরি কেন ?' থমথমে গলায় জানতে চাইলেন হাফিজুর রহমান।

'দেরি কোথায় ? ঠিক সময়েই তো এলাম।' শিরিনের ইচ্ছে হয়েছিল স্বামীর সাথে সহজ আচরণ করতে, প্রশ্ন শুনে সে ইচ্ছে উড়ে গেল। বরঞ্চ এক ধরনের দৃঢ়তা যেন গলায় চেপে বসলো।

'গাড়িতেই যাওয়া আসা করো ?'

'যাই রিকশায়, আসি গাড়িতে। কেন, জানো না তুমি ?'

'বলোনি তো, জানবো কোত্থেকে ?'

'বলার জন্য তোমাকে পাওয়া যায় ? যাও সেই সকালে, আসো তো রাত দশটার পর। এসেই ঘুম দাও, কথা শোনার প্রয়োজন আছে তোমার?'

শিরিনের মেজাজ চড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছেন না হাফিজুর রহমান। প্রশ্ন করেই চলেছেন। গলার স্বরও যেন বেড়ে যাচ্ছে উভয়ের। সৌরভের কথা যেন এ মুহূর্তে ভুলে গেছেন তারা, উচ্চ কথাবার্তার আওয়াজ ওর রুম থেকে স্পষ্টই শোনা যায়, খেয়াল নেই তাদের।

'ওটা কি অফিসিয়াল গাড়ি ?'

'হ্যাঁ, অফিসিয়ালই, তবে আমাদের বসই ব্যবহার করেন। ওনার বাসা আধা কিলোমিটার আগেই, বাকী পথটুকু ড্রাইভার এগিয়ে দিয়ে যায় আমাকে, এনি প্রবলেম ?' প্রায় চিৎকার করে ওঠে শিরিন।

দপ্ করে যেন নিভে গেল হাফিজুর রহমান। তবে কি আজকাল শিরিন বসের গাড়িতেই ঘুরে বেড়ায় ? বুকটা যেন খা খা করে উঠলো, যেন ছোবল বসালো এক

অশনি ধাক্কা। তারও অফিসে রয়েছে এক জুনিয়র সহকর্মী, তরুণী। হৃদ্যতা হয়েছে উভয়ের, মাঝে মাঝে ঘুরেও বেড়াচ্ছে দুজনে।

নিজের অবস্থান থেকে নিজের মূল্যায়ন করা যায় না, নিজেই কি তরুণীটির প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছে ? শিরিনও কি তার বসের প্রতি ? এ কারণেই কি স্বামী-স্ত্রীতে দৈহিক টানও কমে গেছে, আবেগে ধস নেমেছে ? দুর্বিষহ এক সন্দেহের পোকা যেন ঝাপটে ধরেছে নিজেকে।

অনেকক্ষণ পর যেন শিরিন ফিরে এলো নিজের মাঝে। সৌরভের রুমে গেল। নির্বিকার বসে আছে সৌরভ। টের পেলো তবুও তাকালো না মায়ের মুখের দিকে।

মায়ের মন পুত্রস্নেহে হাহাকার করে ওঠে, ইচ্ছে হলো বুকে জড়িয়ে আদর করে দিতে। সৌরভের নির্লিপ্ততায় ধাক্কা খেলো, সাথে সাথে যেন টের পেলো সন্তানের অবস্থান, সন্তান যেন তার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে, অদ্ভুত এক ব্যারিকেড যেন আটকে দিচ্ছে স্নেহের অকৃত্রিম ধারা।

পর্যালোচনা

দুটো দৃশ্যপট দেখলাম আমরা।

সৌরভ। দশ বৎসর বয়স, ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র। ছিল উচ্ছল, দূরন্ত। পড়ালেখার প্রতি যেমন মনোযোগী, খেলাধূলায়ও ছিল তার সমান আগ্রহ।

সৌরভ আর জরিনার দৃশ্যপট, জরিনা ও হাফিজুর রহমানের সংলাপে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে সৌরভের– আচরণের পরিবর্তন, অস্বাভাবিকতা। দ্বিতীয় ইপিশোডের শেষাংশে শিরিন ও হাফিজুর রহমানের উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে একটি ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সাংসারিক জীবনের ছবি ভেসে উঠেছে। এটি কেবলই গল্পের ছবি নয়, বাস্তব জীবনেরই অনুসঙ্গ। দাম্পত্য জটিলতার সূক্ষ্ম জাল কীভাবে জট পাকাতে থাকে, কীভাবে সন্তানের মনস্তাত্ত্বিক গড়নে ধস নামাতে পারে, কীভাবে স্বামী-স্ত্রীর অসুস্থ সম্পর্কের পাকে সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণের পথ হুমকির সম্মুখীন হয়, সর্বোপরি সৌরভের বিষণ্নতা রোগ কেন জটিলতর হয়েছে, উপসর্গগুলো সহ বিধৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সন্তানের প্রতি কারুরই স্নেহের অভাব নেই, সন্তানের মঙ্গল চিন্তায় সবাই যত্নবান। যত্নবান হলেও সময় নেই, তদুপরি দুজনেই নিজেদের জটিল জীবনের চাকায় জড়িয়ে ছুটছে, দূরে সরে যাচ্ছে একে অপর থেকে, ভালোবাসার বন্ধন হয়ে পড়েছে শিথিল। যদিও একের জন্য অপরের মমত্ববোধের অভাব নেই, উভয়ই

ক্ষণেক্ষণে বাসার পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে, অস্বাভাবিক আচরণ ও অসামঞ্জস্য প্রকাশ ভঙ্গির কারণে মায়াময় পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে– এ নিয়ে কারো তেমন ভাবনা নেই, ভাবনা কেবল সন্তানের 'মঙ্গল'।

না, কেবল 'ভাবনা' দিয়ে সন্তানের মঙ্গল হয় না। প্রয়োজন সুস্থ প্রেমময় পারিবারিক সাঁকো নির্মাণ করা, নইলে একটি শিশু নানা ধরনের মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে, যেমনটি হয়েছে সৌরভের। ইদানিং এ ধরনের সমস্যা আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেড়েই চলেছে।

তাই দেখা যায় বিষণ্নতা রোগ কেবল বড়দের নয়, ছোটদেরও হয়। বড়দের ক্ষেত্রে মেয়েদের বেশি হয় (২ঃ১)। ছোটদের মধ্যে ৯ থেকে ১৫ বৎসরের শিশুরাই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ, তবে স্কুলগামী এসব শিশুদের মধ্যে ছেলেদের আক্রান্তের হার বেশি। পূর্বে বলা হতো দশ বৎসরের শিশুদের ০.২% এবং চৌদ্দ বৎসরের শিশুদের ২% বিষণ্নতা রোগে ভুগে থাকে। সাম্প্রতিক গবেষণায় বলা হচ্ছে, বয়োঃসন্ধিক্ষণের পূর্বে ১–২% এবং টীন এজে ২–৫% এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পঞ্চাশ শতাংশ শিশুর বিষণ্নতা রোগের সাথে একই সময় ঘটতে পারে কণ্ডাক্ট ডিসঅর্ডার, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার। এসব শিশুরা ডিপ্রেশন চলাকালীন সময়ে বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না– গড়া তো দূরের কথা। পড়ালেখায় কিংবা যে কোনো কাজে এদের মনোসংযোগের মতো গুরুত্বপূর্ণ 'কগনেটিভ' বিষয়টিতে ধস নামে, অতৃপ্তিতে পূর্ণ থাকে মন, বিরক্তির মাধ্যমেই সব কিছুর বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এরা, ধীরে ধীরে স্কুল থেকে পিছিয়ে পড়ে। বুদ্ধিদীপ্তির বহিঃপ্রকাশ দূরের কথা, ভবিষ্যৎ এদের অন্ধকার হতে থাকে।

কিশোর-কিশোরীর বিষণ্নতা রোগের উপসর্গ বড়দের মতো হতে পারে, যেমন– ঘুমের সমস্যা, মন খারাপ থাকা, মাদকাশক্তি প্রবণতা, আত্মহননের চেষ্টা চালানো। কিশোরীদের চেয়ে কিশোরদের মাঝেই এই প্রবণতার হার বেশি।

কারণ

১। বংশগত কারণ ঃ পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন বা অতি নিকটাত্মীয় কারুর মধ্যে এই রোগ থাকলে, শিশুটির মাঝে এই রোগ চলে আসতে পারে।

২। পরিবেশগত কারণ ঃ মা-বাবা বৈবাহিক সম্পর্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আগেই বলা হয়েছে। পারিবারিক অশান্তি বিবাদ সন্দেহ উগ্রতা মা-বাবা সেপারেশন কিংবা ডিভোর্স অথবা এগারো বছরের পূর্বে মা-বাবার মৃত্যু বিষণ্নতা ঘটাতে পারে সন্তানের মাঝে।

অনেকে মনে করেন সংসারে টুকটাক ঝামেলা তো থাকবেই, এ ধরনের পরিস্থিতিকে তারা স্বাভাবিক হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু সন্তানের সামনে দীর্ঘমেয়াদী অস্বাভাবিক 'টুকটাক' ঝামেলাও ক্রমে ক্রমে শিশুর সমস্যাকে বাড়িয়ে দিতে পারে।

তবে সবারই বিষণ্নতা রোগ হবে, এমন নয়। এক এক জনের ধারণ, গ্রহণ ও মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এক এক রকম হয়। ফলে কেউ সহজে আক্রান্ত হয়, কেউবা আবার আক্রান্ত হতে পারে কণ্ডাক্ট ডিসঅর্ডার কিংবা অ্যাংজাইটি রোগে।

৩। শারীরিক কারণ ঃ বাড়ন্ত শিশুদের বেলায় দেখা গেছে, 'গ্রোথ হরমোনের অসামঞ্জস্য নিঃসরণের কারণেও বিষণ্নতা হতে পারে।

৪। অন্যান্য কারণ ঃ শিশুর নিরাপত্তার অভাববোধ, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সমর্থনের অভাব, হঠাৎ কোনো পারিবারিক দুর্ঘটনা, ছোটভাইবোনের জন্ম একটি শিশুর মাঝে এই রোগ বয়ে আনতে পারে।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন যে 'বিষণ্নতা' (Depression) এবং বিষণ্নতা রোগ (Depressive disorder) এক না।

'বিষণ্নতা' একক একটি উপসর্গ, 'বিষণ্ন রোগ' বিষণ্নতাসহ আরো কিছু উপসর্গের সমাহার।

চিকিৎসা

ফ্যামিলি থেরাপী, স্কুল লিয়াজন (School Liaison), সাপোর্টিভ থেরাপী সাধারণত ব্যবহার করা হয়। যেসব কারণে স্ট্রেস হচ্ছে, ঘটনাগুলো কমানোর জন্য এই থেরাপীগুলো গুরুত্বপূর্ণ। 'নেগেটিভ কগনিশন' পরিবর্তন করার জন্য দেওয়া হয় 'কগনিটিভ থেরাপী'। এটির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস ও পরিস্থিতি মোকাবেলা করার দক্ষতা বাড়ানো যায়। এছাড়াও রয়েছে 'স্যোশাল স্কিল ট্রেনিং' এবং ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা। অনেকক্ষেত্রে বিষণ্নতা বিরোধী ওষুধও ব্যবহার করা হতে পারে। সাফল্যের হার নিয়ে মতভেদ রয়েছে, তবুও আত্মহনন মূলক সমস্যায় ব্যবহার করে থাকেন মনোচিকিৎসকরা।

কোথায় পাবেন চিকিৎসা সেবা

চিকিৎসার ব্যাপারে প্রয়োজন মা-বাবার সচেতনতা। দুঃখজনক এই যে, বৈজ্ঞানিক যুগেও অন্ধকারের খোলস থেকে আমরা বেরুতে পারিনি এখনো, তাই সঠিক জায়গায় সঠিক চিকিৎসকের কাছে হাজির হতে পারি না।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা অন্যান্য মানসিক রোগ ও মনোসংকটের পাশাপাশি এ ধরনের রোগেরও চিকিৎসা করে থাকেন। যেসব মেডিকেল কলেজে মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ আছে, সমস্যা নিয়ে সেখানে হাজির হতে পারেন যে কেউ। সম্প্রতি ঢাকা-য় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বহিঃবিভাগে পরিচালিত হচ্ছে 'চাইল্ড মেন্টাল হেলথ ক্লিনিক'। প্রতি বুধবার বসছে এই ক্লিনিক। এ ছাড়াও এ ধরনের চিকিৎসার সুব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে 'মনন সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল' মনিপুরী পাড়া, ঢাকায়।

সচেতনতাসহ এগিয়ে আসা জরুরী, আক্রান্ত শিশুর মঙ্গলের জন্য বিলম্ব করার সময় আর নেই। যতো দ্রুত সমস্যা মোকবেলা করা যাবে ততোই মঙ্গল, নইলে দেখা যাবে শিশুর সামাজিক ও বুদ্ধিবিকাশের ধারা ক্রমশ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শিশুর বুদ্ধিদীপ্ত ভবিষ্যতের স্বার্থেই দাম্পত্য সমস্যাও মিটিয়ে নেওয়া উচিত, দম্পতিরাও গ্রহণ করতে পারেন মনোচিকিৎসা।

মৌচাকে ঢিল

ভয় ভয় লাগছে সুমিতের।

ওরা যে বাড়িতে উঠেছে সে বাড়িটি পুরনো আমলের বেশ ক'বছর খালি ছিল। শরীর ছম ছম করা নিস্তব্ধতা যেন মেখে আছে বাড়িটির ভিতর।

ছাদ অনেক উপরে, মোটা দেয়াল চারিদিকে। ইটের কংক্রিটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাংলোটি, যেন যুগের সাক্ষী। কোথাও কোথাও সিমেন্টের পলেস্তার খসে গেছে, এ্যাবড়ো খেবড়ো দেয়াল যেন বিকট দাঁত বের করে অট্টহাসি হাসছে কেবল।

বাংলোটির বাহিরের বাউণ্ডারি এলাকা অনেক বড়, উঁচু দেয়াল ঘেরা। দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে নারিকেল গাছ, আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, তাল, সুপারি ও নানা জাতের গাছ।

সন্ধ্যা হলে নানা রকম পাখি এসে ভিড় করে, কিঁচির মিঁচির শব্দে আলাদা একটা আমেজ তৈরি করে। বড়ই ভালো লাগে সুমিতের।

বাহিরের গেইট থেকে মূল বাড়ি পর্যন্ত রয়েছে একটি সরু সিমেন্টের রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে আছে গোলাপ, বেলি, গন্ধরাজ এবং জবা ফুলের সারি। ফুলে ফুলে ভরে থাকে, মৌ মৌ গন্ধ যেন বাড়িটির আলাদা আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে। তাই ভয় ভয় লাগলেও বাড়িটির জন্য এক ধরনের মায়া বসে গেছে সুমিতের।

এমন পরিবেশে আগে কখনও থাকেনি ওরা, থেকেছে বহুতল ভবনে। কঠিন দেয়াল আর বিদ্যুতের ঝলকানি ছাড়া কোনো প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে পরিচয় নেই ওর।

রাত বাড়তে থাকলে কেমন ভূতুড়ে ভূতুড়ে মনে হয় চারিদিক। তবে ভূত টুত বিশ্বাস করে না সে।

একটা বড় সমস্যা দিশেহারা করছে সুমিতকে। বেডরুমে লাইট জ্বালালেই মহা প্রলয়ংকরী কাণ্ড ঘটে যায়, ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি ঢুকে রুমে, জ্বলন্ত বাল্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, উত্তপ্ত বাল্বের গায়ে ঠোক্কর খেয়েও মৌমাছিগুলোর হুঁশ হয়

না, বারবার ঠোক্কর দেয়, মুখ থুবড়ে পড়ে যায় নিচে। আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, মরেও অনেক। তবুও যেন ওদের সংখ্যা কমে না, দিনে দিনে বাড়ছেই কেবল।

বাগান বাড়িটির এদিক ওদিক চক্কর দেয় সুমিত। গাছের ফাঁক-ফোকর তন্ন তন্ন করে দেখে, কোনো মৌচাক নেই। অথচ লাইট জ্বালালেই চোখের পলকে মৌমাছি ভিড় করে, কোত্থেকে আসে!

রহস্যের কোনো কিনারা হয় না, চিন্তায় অস্থির সে। মৌচাক বের করতেই হবে, এক ধরনের জেদ চেপে ধরে ওকে। বিফল হতে চায় না, সফলই হতে চায় সে।

বাংলোটির কেয়ারটেকার একজন বৃদ্ধলোক, ওবায়েদ মিয়া। দীর্ঘদিন বাড়িটি পাহারা দিয়েছে, মাস্টার বেডরুমে তালা দিয়ে রাখতো, দিনের বেলায় ঝাড় দিতো মাঝে মাঝে। দু'একটা মৌমাছি দেখেছে, তবে এমন ঝাঁক বাঁধা মৌ আর দেখেনি, তিনিও চিন্তিত, চিন্তার শেষ নেই।

মৌমাছি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, মধু চুষে নেয়। ঝাঁকে ঝাঁকে মিলেমিশে মধু জমায়, চাক তৈরি করে। চাক ভরা মৌ দেখার লোভ কীভাবে লুকোবে সুমিত!

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো কোনো ফুলেই কখনই মৌমাছি বসতে দেখেনি সে। এ আবার কোন জাতের মৌমাছি! ফুলে বসে না, চাক বানায় না, কোনো এক ভূতুড়ে গর্তে লুকিয়ে থাকে। লাইট জ্বালালেই নিমিষে জড়ো হয়, অন্য কোনো রুমে নয়, কেবল মাস্টার বেড রুমেই ওদের ভিড়।

এই রুমের প্রতি এতো আসক্তি কেন ওদের ?

তবে কি মৌমাছি সম্বন্ধে এতো দিনে সে ভুল তথ্য জেনেছে ?

সুমিত যেন নিজের ভিতরের সাহস হারিয়ে ফেলছে, কিন্তু দমে যায় না। ওবায়েদ মিয়ার হাত ধরে।

'দাদু চলো, বাড়ির পিছনের দিকের জঙ্গলটি দেখে আসি।'

'ওখানে কোনো চাক নেই, আমি দেখেছি।'

'তুমি তো বুড়ো, চোখেও কম দেখো, তোমার দেখা দিয়ে কি হবে ? চলো, আমি সহ যাই। আমার চোখেই দেখবো।'

'ওদিকে খুব ঝোঁপ-ঝাড়, সাপ-টাপ থাকতে পারে।'

'সাপ ভয় পাই না আমি।' কড়া সুরে বললো, সুমিত।

এ এক স্বভাব ওর। বড়দের কথা শুনতে চায় না, পরামর্শও মানতে চায় না, সব নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চায়, নিজের চোখে দেখতে চায়। এখনো বুদ্ধির পুরোপুরি বিকাশ ঘটেনি, এ কথা মানতেই চায় না সে।

'দাদু, চলো, দাঁড়িয়ে আছো কেন ?'

ওবায়েদ মিয়া একদিনেই সুমিতের সম্পর্কে অনেক কিছু ধারণা করেছে, একবার যা করতে চাইবে তা করেই ছাড়বে। কোনো যুক্তি বা নিষেধ মানবে না।

একটি লাঠি হাতে নেন তিনি। দুজনেই বাড়ির পিছনের বিস্তীর্ণ জঙ্গলা এলাকাটির দিকে পা বাড়ায়।

মাটিতে বড় বড় ঘাস, নানাজাতের ছোট ছোট গাছ-গাছালি, আগাছা। বড় বড় কচু গাছও রয়েছে, এদিক ওদিক অক্টোপাসের হাতের মতো যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মোটা মোটা কচুর লতি।

হাঁটতে গিয়ে পা পিছলে যাচ্ছে, মাটি স্যাঁতস্যাঁতে।

দড়ির মতো একটি লতির ওপর পা পড়ে সুমিতের। ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা লাগে। তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে সে।

লতিটিকে ভেবেছিল সাপ, সড়াৎ করে বুকে যেন চেপে বসেছিল ভয়। ভয় দেখালে চলবে না, ভিতরে ভয়, উপরে সাহস। সাহস নিয়েই বললো, 'ভয় পাইনি দাদু, ওটা সাপ নয়, লতি'।

একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়। চোখ বড় করে কি যেন দেখে।

'এগুলো কি দাদু ?'

'শামুক।'

'শামুক!'

'হ্যাঁ, শামুকই তো।'

'ওরা গাছে উঠলো কি করে ?'

ওগুলো হাঁটতে পারে। কচু গাছ বেয়ে পাতার কাছে চলে এসেছে, পাতার উল্টো পিঠে বসে আছে চুম্বকের মতো। ব্যাপারটি অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য।

শামুকের পিঠ জুড়ে রয়েছে শক্ত আবরণী, খোলস। খোলসের ভিতর রয়েছে নরম মাংসল শরীর। মানুষের সাড়া পেয়ে মাংসল দেহ প্রায় ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলেছে, তবুও কিভাবে যেন ঝুলে আছে পাতার নিচের দিকে।

কীভাবে লেগে আছে পাতার সাথে!

কৌতূহল জাগে সুমিতের মনে। ইচ্ছে হলো একটি শামুক হাতে নিতে। হাত বাড়ায় সে, হাতের ছোঁয়া পেয়েই পুরো নরম অংশই খোলসের ভিতর টেনে নিলো শামুকটি। পাতা থেকে আলগা হয়ে গেছে, প্রায় পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে, টুপ করে ধরে ফেলে সুমিত।

খোলসটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে। দেখার কিছুই নেই, সবটুকু অংশই ভিতরে ঢুকে গেছে।

হাসি ফোটে সুমিতের ঠোঁটে। শামুক ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়ে ঢুকে গেছে নিজের আস্তরণে।

তাই বলে সে ভয় পাবে না, রণে ভঙ্গ দেওয়াও তার স্বভাবে নেই, লক্ষ্যে সে পৌঁছবেই, যতোই বিপদ আসুক কিছুতেই পিছু পা হবে না।

কঠিন এক আগ্রহ চেপে বসেছে সুমিতের মনে। পাশ কাটিয়ে ওবায়েদ মিয়ার সামনে চলে এসেছে। এগোতে থাকে দ্রুত, পদক্ষেপ বেশ দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী।

যে কোনো কাজে আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো, অতিরিক্ত বিশ্বাস ভালো না। লক্ষ্যে পৌঁছার সাফল্যের সম্ভাবনা না থাকলে, অতিরিক্ত বিশ্বাস কষ্টই বয়ে আনবে, আনন্দ নয়।

কিন্তু সুমিত ভিন্ন ধাতে গড়া, সামনে এগিয়ে যায় দীপ্ত পায়ে।

হঠাৎ ঝোঁপের ভিতর সর.....সর শব্দ হয়।

একটা সাপ দ্রুত চলে গেল পাশ দিয়ে, কিছু বোঝার আগেই বিকট এক চিৎকার দেয় সুমিত। দু'হাতে ওবায়েদ দাদুকে জড়িয়ে ধরে, বুক কেঁপে ওঠে, এখনো কাঁপছে সে। জীবনে প্রথম সাপ দেখলো সুমিত, গায়ে হলুদ রঙের কারুকাজ, ডোরা কাটা। বুকের ওপর দিয়ে পিছলে দ্রুত গতিতে কেমন করে পালিয়ে গেল! সাপটি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহস ফিরে পেলো সুমিত, মুখে আবার কথা ফুটতে থাকে।

'দাদু সাপ কি মানুষ ভয় পায় ?'

'পায়ই তো, দেখলে না ?'

'আমি যে শুনেছি সাপ মানুষকে কামড় দেয়, বিষ দাঁত বসিয়ে দেয়, সাপের বিষে মানুষ মারা যায়।'

'ক্ষতি করতে চাইলেই সাপ মানুষের দিকে তেড়ে আসে, প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে।'

'সব সাপ কি একই রকম আচরণ করে ?'

'না সবগুলো এক রকম নয়। যেমন এটি ঢোঁড়া সাপ। ঢোঁড়া সাপ ভিতু, মানুষ দেখে ভয় পায়, তাই আমাদের সাড়া পেয়েই পালিয়েছে।'

'তাহলে সাহসী সাপ কোনটি ?'

'আছে, অনেক সাপই বিষাক্ত, সাহসী। যেমন- কেউটে, কালসাপ, কালনাগিনী। এগুলো মানুষ দেখলেই তেড়ে আসে, নিমিষেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিষ দাঁত বসিয়ে দেয়। বিষধর সাপের আচরণই এমন ভয়াবহ।'

সুমিত যেন একটু বেশি ঘাবড়ে গেছে, গায়ের লোমগুলো আতঙ্কে খাড়া হয়ে গেছে। চোখ গোল গোল করে সাবধানে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

'এখানেও কি বিষধর কেউটে, কালনাগিনী আছে দাদু ?'

'থাকতে পারে।'

সামনে এগোনোর ইচ্ছে দমে গেল, এক পা পিছিয়ে এলো। তবে কেউটে দেখার অদম্য লোভ মিলিয়ে যায়নি, একটু একটু রয়েছে।

এসেছিল মৌচাকের সন্ধানে। ভয়াল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সে কথা ভুলেই গিয়েছিল সুমিত। দেখলো শামুক, সাপ। এমন জংলী বাড়িতে কিভাবে এলো বাপি!

দড়াম দড়াম বাহিরের গেটে আঘাত পড়ছে।

কি ব্যাপার! ইলেকট্রিসিটি কি নেই! কলিং বেল কি টিপতে পারে না! কোন গেঁয়ো এলো আবার! এ সময় তো মামণি-বাপি আসার কথা নয়, ওঁনারা অফিসে।

গেটের ওপর বিকট ধাক্কা মৌচাক খোঁজার নেশা, সাপ দেখার কৌতূহল দমিয়ে দিলো। অন্য নেশা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নেশাটি হলো, কলিং বেলের শব্দ পেলেই ছুটে যাবে, নিজেই গেট খুলবে।

ওবায়েদ মিয়াকে কিছু বোঝার সুযোগ না দিয়ে এক ছুটে চলে এলো গেটের কাছে। চিৎকার করে জানতে চাইলো, 'কে?'

ওপাশে কোনো সাড়া নেই, মনে হলো আগন্তুক চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ভয়ংকর কেউ কি ! চোর-ডাকাত নয়তো! এমন চুপ করে আছে কেন!

আবারো চিৎকার করে দেয় সে, 'কে ? কে ?'

না, কোনো সাড়া নেই। একটু সাহসী হয়ে ওঠে, ক্ষুদ্ধও হয়। সাহস এবং আতংকের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে গেটের ছোট অংশটি আলতো করে খোলে।

না, কেউ নেই। একটি খালি ট্যাক্সি ফিরে যাচ্ছে।

এবার ভয়ে মন ছমছম করে উঠলো, ভূতটুত নয়তো!

গেটের বাইরে মাথা বের করে দেখতে যাবে, অমনি পাশ থেকে হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়লো একজন।

'ওমা!' বলেই ভয়ংকর এক চিৎকার দিলো সুমিত।

কতোক্ষণ স্তব্ধ, তারপরই আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

'রুহি খালামণি, তুমি!'

হ্যাঁ। সুমিতের মেজো খালামণি এসেছে। কাঁধে ব্যাগ, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, মুখে আদুরে হাসি।

খালার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে, আনন্দে দিশেহারা হয়, কিন্তু বেসামাল হয়নি। মনে মনে কুট কৌশল আঁটতে থাকে। তাকে ভয় দেখানোর মজা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেবে, প্রতিশোধ নেবে। রুহি খালামণিকে জব্দ করার জন্য প্লান করতে থাকে সে।

ব্যাগ কাঁধে নিয়ে মেজোখালা গেস্ট রুমে ঢুকলো।

'না, তুমি আমার সাথেই শোবে। মাস্টার বেড রুমে চলো।' সুমিত বায়না ধরলো।

'সেকি! তোমার বাপি তাহলে কোথায় শোবে?'

'কেন! গেস্টরুমে! বাপিকে ভাগিয়ে দেবো আমাদের রুম থেকে।'

ইউনিভার্সিটি বন্ধ হওয়াই বোনের বাসায় বেড়াতে এসেছে রুহি, দুষ্টু ভাগ্নেটাকেও দেখতে এসেছে, ভাগ্নের সাথে খুব বন্ধুত্ব তার।

খুব ক্লান্ত সে, গোসল করে খেয়ে নেয়, শরীর শিথিল হয়ে আসছে, ঘুম আসছে, ঘুমের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। সুমিতও মনে মনে তাই-ই চাচ্ছিল।

হঠাৎ যেন আকাশ মেঘে ঢেকে গেল, রোদ কমে গেছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস শুরু হয়েছে।

রুহি শুয়ে পড়ে।

সুমিত বারবার ঘড়ি দেখছে, না। এখনো দেরি আছে, বিকেল চারটার আগে মামণি-বাপি ফিরবে না, খালামণিকে সাজা দেওয়ার এই-ই উপযুক্ত সময়।

বেড রুমের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিলো সে, খালামণি ঘুমিয়ে পড়েছে।

পা টিপে টিপে রুমে এলো, সুইচ বোর্ডের কাছে গেল, সুইচ অন করলো, লাইট জ্বলে উঠলো।

না, খালামাণির ঘুম ভাঙ্গেনি, গভীর ঘুমে মগ্ন।

সুমিত দ্রুত পর্দার কাছে ফিরে এলো, লাইটের দিকে তাকিয়ে হা হয়ে গেল।

একটা মৌমাছিও এলো না। তাজ্জবের ব্যাপার! এমন তো কোনোদিন হয়নি! প্লান ছিল ঘুমন্ত খালামণিকে মৌ'র হুল খাওয়াবে, ভয় দেখানোর প্রতিশোধ নেবে। সব যে ভণ্ডুল হয়ে গেল!

তবে কি মৌ'রা খালামণিকে চেনে? আপন ভাবে? কেবল সেই কি মৌ'দের শত্রু?

মন খারাপ হয়ে যায় ওর, রুমে ঢোকে। খালামণির পাশে শোয়, এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যেই মেঘ কেটে গেছে, রোদ বেড়েছে, শীতল বাতাসও কমে গেছে, দিন আবার ঝলমল হয়ে উঠলো।

ঘুমের মাঝেই সুমিত স্বপ্ন দেখে, হাজার হাজার মৌমাছি উড়ছে। ভোঁ ভোঁ করে উড়ছে, তাকে ঘিরে ধরেছে, এদিক ওদিক ছুটছে সে, পালাতে চাইছে কিন্তু পারছে না পালাতে।

হঠাৎ বিকট এক চিৎকার দিয়ে ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠে সুমিত, থরথর করে কাঁপছে, পায়ে যেন কাল কেউটে কামড় বসিয়ে দিয়েছে।

'বিষ! বিষ!' চিৎকার করতে থাকে সে।

রুহি লাফিয়ে ওঠে। সারা ঘরে মৌমাছি ভোঁ ভোঁ করছে, বিশেষ করে বাল্বের কাছে জমা হয়েছে অসংখ্য। ক্ষণিকের জন্য বোবা হয়ে যায় সে। তারপরই সুমিতের দিকে খেয়াল করে।

একটি মৌমাছি হুল ফুটিয়ে বসে আছে সুমিতের পায়ে, এ কারণেই ব্যথায় চেঁচাচ্ছে সে।

রুহি দ্রুত হাতে কামিজের কাপড় দিয়ে জড়িয়ে মৌমাছিটি ধরে, চিমটি দিয়ে হুলটি তুলে নেয়, পাজাকোলে ওকে নিয়ে বেরিয়ে আসে, ফ্রিজ থেকে বরফ নেয়, চেপে ধরে ক্ষত স্থানে।

রুহি প্রাণী বিদ্যার ছাত্রী। মৌমাছি সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানে। বেড রুমে ফিরে এলো, সুইচ বন্ধ করেই দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো।

অসংখ্য মৌমাছি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মেঝেতে, গড়াগড়ি খাচ্ছে, মুহূর্তের মধ্যে রুম খালি। কিছু মরে গেছে, কিছু জানালা দিয়ে পালিয়েছে, ভোজ বাজির মতো বাকিরা যেন হাওয়া হয়ে গেল।

হঠাৎ খেয়াল করলো দু'টি আহত মৌমাছি দেয়াল বেয়ে আস্তে আস্তে ভেন্টিলেটারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, টুপ করে ঢুকে গেল ভিতরে।

তবে কি ভেন্টিলেটারের ভিতরই মৌমাছিদের বাসা ? ওখানেই কি মৌচাক রয়েছে ?

দ্রুত চিন্তা খেলতে থাকে রুহির মাথায়, সুমিতেরও।

আবারও সুইচ অন করলো ওরা, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখতে লাগলো কোত্থেকে আসে মৌমাছিগুলো।

স্পষ্ট করে বোঝা গেল না, কেবল দেখা গেল অসংখ্য মৌমাছি লাইট ঘিরে ধরেছে।

তবে অনুমান করতে বাকি রইলো না কিছু। আসলে মৌমাছিগুলো ভেন্টিলেটারের ভিতর থেকে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে বেরিয়ে আসে, ভালো করে পরখ করলেও বোঝার সাধ্য কঠিন।

মৌমাছির ত্বরিত গতি এবং ক্ষিপ্রতার কাছে যেন দৃষ্টি শক্তি পরাজিত। সুইচ বন্ধ করলো রুহি।

বেডরুমে মৌমাছির বিচরণ কীভাবে বন্ধ করা যায় ?

ভাবতে থাকে খালা আর ভাগ্নে।

হ্যাঁ, বুদ্ধি মিলেছে। একটা লম্বা মই আছে ঘরে। ভেন্টিলেটারের ভিতরের মুখ শক্ত কাগজ সেঁটে বন্ধ করে দিতে হবে। জানালাও বন্ধ রাখতে হবে যেন বাহির থেকে জানালা দিয়ে ঢুকতে না পারে।

মই নিয়ে এলো দু'জনে। মোটা কাগজ জোগাড় হলো, কস্টেপও খুঁজে পাওয়া গেল।

মই বেয়ে উপরে উঠে আসে রুহি, কাগজটি সেঁটে দেয় কস্টেপ দিয়ে।

মইটি ঠেসে ধরেছিল সুমিত। কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই হাতের চাপ ছেড়ে দিলো, দ্রুত সরে দাঁড়ালো।

মেঝে পিচ্ছিল ছিল, পিছলিয়ে মইটি পিছনের দিকে সরে এলো– ধপাস করে পড়ে গেল রুহি। তাল হারায়নি, ফলে ব্যথা পেলো না একটুও।

খালামণিকে সাজা দিতে চেয়েছিল, ফেলে দিয়ে ব্যথা দিতে চেয়েছিল। ফেলতে যদিও পেরেছে, ব্যথা দিতে পারেনি। মৌমাছির হুল খাওয়াতে চেয়েছিল, কামড় খেয়েছে নিজে। বারবার পরাজিত হচ্ছে সুমিত, কোনোমতেই তাকে ভয় দেখানোর প্রতিশোধ নিতে পারেছে না।

এটিই চরম সত্য। কাউকে আঘাত করতে গেলে আঘাত খেতে হয়, হাতে হাতে প্রমাণ পেলো সুমিত।

হঠাৎ কিসের যেন গর্জন শোনা যাচ্ছে, সোঁ সোঁ করছে, ক্রমান্বয়ে বাড়ছেই যেন অস্বাভাবিক শব্দটি। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে ওরা।

হন্তদন্ত হয়ে এ সময় ওবায়েদ মিয়া ছুটে আসে খবর নিয়ে।

ভেন্টিলেটারের বাহিরের মুখ দিয়ে হাজার হাজার মৌমাছি বেরিয়ে পড়েছে, নিজেদের আস্তানায় বাধা আসাতে ওরা ক্ষেপে গেছে, গর্জন তুলেছে। বিক্ষুদ্ধ হয়ে এদিক ওদিক ওড়াওড়ি করছে। দেখার জন্য বাহিরে এলো দু'জন।

বাড়ির পিছনের দিকে রয়েছে বিরাট এক কৃষ্ণচূড়া গাছ। গাছে ফুল নেই এখন, কিছুটা বিবর্ণ। গাছের ডালের কোণে রয়েছে বড় একটি গর্ত মতো ঢালু জায়গা। একদল মৌমাছি ওখানে বাসা বানাতে শুরু করেছে, মুহূর্তের মাঝে যেন চাক তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে সুমিত।

মৌমাছিগুলো কতো একতাবদ্ধ! কতো সংঘবদ্ধ!

অথচ ওর ক্লাসের ছেলেরা কেমন! দলাদলি করে! মারপিঠ করে। ওরা কি মৌমাছির মতো এতো সুশৃঙ্খল হতে পারে না ?

'ওগুলো কি কামড়াবে আমাদের ?' খালামণির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সুমিত।

'না, এখন কামড়াবে না। কারণ ওরা এখন নতুন চাক বানাতে ব্যস্ত, কাজের সময় ওরা কেবল কাজই বোঝে, কাউকে আক্রমণ করে না।'

'সবাই কি একই কাজ করে ?'

'না। ওদের মাঝে বিভিন্ন ভাগ রয়েছে। আছে রাণী মৌমাছি, সেবিকা মৌমাছি, শ্রমিক মৌমাছি ও স্কাউট মৌমাছি। স্কাউটরা খাদ্যের সন্ধান করে, উৎস আবিষ্কার করে। শ্রমিকরা খাদ্য আহরণ করে, চাক বানায়। রাণী মৌমাছি ডিম পাড়ে, নেতৃত্বের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল রাখে সবাইকে। সেবিকারা রাণীর সেবা করে, ডিমের পরিচর্যা করে, লাভা ফোটা পর্যন্ত ঘনঘন পরিচর্যা চালাতেই থাকে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, সূর্যের অবস্থান ধরে ফেলতে পারে স্কাউটরা। কারণ অতি বেগুনী রশ্মি মৌমাছিদের চোখে সংবেদনশীল, তাই মেঘ ভেদ করে তারা সূর্যের আলো দেখতে পারে। তবে এ সময় সাধারণত মৌ'রা নড়ে না, উড়ে না, চুপচাপ থাকে।'

'ওঃ! এ কারণেই মৌ'রা তোমাকে আক্রমণ করেনি, তাই না ?'

'কোন কারণে ?'

'যখন তুমি ঘুমিয়েছিলে মৌ'র হুল খাওয়ানোর জন্য বেডরুমে লাইট জ্বালিয়েছিলাম আমি। বাইরে তখন মেঘ ছিল, একটা মৌমাছিও বের হয়নি।'

'ওরে দুষ্টু! এই তোর মতলব ছিল! দেখেছিস্ তো শেষমেষ কামড় খেলি নিজে!'

সুমিত একথা আর খেয়াল করলো না। মাথার ভিতর ঘুরতে থাকে অন্য চিন্তা। চাকের ভিতরে কি থাকে দেখার বড়ই লোভ জাগে, মধু দেখার ইচ্ছেও সংবরণ করতে পারে না ও।

অতিদ্রুত কৃষ্ণচূড়ার ডালটিতে চাক তৈরি করে ফেললো মৌমাছিরা; কী ক্ষিপ্রতা! কী দক্ষতা!

দেখে দেখে মন ভরে গেল আনন্দে, আনন্দ দমিয়ে রাখে সে। মৌচাকের রহস্যাদ্ঘাটনের জন্য এখন অভিযান চালানো যাবে না, কারণ মামণি-বাপি এখনই চলে আসবে।

পরের দিনের ঘটনা, সকাল প্রায় দশটা, স্কুলে যায়নি সুমিত। মাথার ভিতর দুষ্টু পোকা কিলবিল করছে।

রুহি খালামণি জিটিভি দেখছে। ড্রয়িং রুমে টিভির সামনে বসে আছে।

চুপিচুপি বাসা থেকে বের হলো, সোজা চলে এলো বাড়ির পিছনে।

মৌচাকটি আরো বড় হয়েছে। চাকের আশে পাশে হঠাৎ হঠাৎ দু'চারটে মৌমাছি ওড়ে, আবার গিয়ে বসে।

ওরা সম্ভবত পাহারাদার, চাক পাহারা দিচ্ছে।

একটি ইটের টুকরো হাতে নেয় সুমিত, ছুঁড়ে মারে চাকের দিকে, লক্ষ্য ভ্রষ্ট। ইট আঘাত হানেনি চাকে। আবারো ইট হাতে নেয়, ছোঁড়ে, আবারো লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় ইটটি।

বাড়ির পিছনেই সরু সরু অনেক বাঁশ স্তূপ করে রাখা আছে, একটি হাতে নিলো ও।

বাঁশ দিয়ে সজোরে একটা গুঁতো দেয় চাকে। গুঁতো দিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল সুমিত।

চাক ভেঙ্গে গেছে, ভোঁ ভোঁ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে ওরা। একদল তেড়ে এলো সুমিতের দিকে।

ছুটে পালাতে চাইলো ও, দিলো ছুট। ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে, পালাতে পারলো না। অসংখ্য মৌমাছি ঝেঁকে ধরেছে ওকে। মুখে, শরীরে মাথায় হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে।

ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে সুমিত, চিৎকার জুড়ে দেয়।

চিৎকার শুনে খালামণি ছুটে এসেছে। ওবায়েদ মিয়া এসেছে। কাজের মেয়ে হামিদাও এসেছে।

কোনো মতে উদ্ধার করে ওকে নিয়ে এলো ভিতরে। সারা শরীর মুখ ফুলে উঠেছে, তীব্র জ্বালায় কাতরাচ্ছে সে।

হুলের সাথে কিছু বিষাক্ত পদার্থ শরীরে ঢুকিয়ে দেয় মৌমাছি, ফলে শরীর জ্বালা পোড়া করে, ব্যথা হয়।

হিস্টাসিন জাতীয় ট্যাবলেট খেলে বিষের প্রভাব কেটে যায়, দ্রুত জ্বালাপোড়া কমে আসে, রুহি এটি জানে।

ওষুধের কৌটা ঘেটে একটা হিস্টাসিন টেবলেট পাওয়া গেল, খাইয়ে দিলো সুমিতকে।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে সুমিত স্বস্তি লাভ করে, চুপচাপ হয়ে গেছে।

রুহি খালামণি কাছে আসে, আদর মেখে জানতে চায়, 'আর কখনো মৌচাকের পিছনে ছুটবে ?'

'না।' ঘাড় দুলিয়ে আলতো করে জবাব দেয় সুমিত।

তারপরই বুক ফেটে কান্না আসে।

চোখ বেয়ে নেমে আসে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু বিন্দু।

ব্যাখ্যা

আমরা দেখলাম কৌতূহলী সুমিতকে।

যে কোনো বিষয়ে জানার প্রতি রয়েছে তার দুর্নিবার আকাঙ্খা, রহস্যাদ্ঘাটনের প্রচন্ড আগ্রহ। সাপ, শামুক দেখে ভয় পেয়েছে সে, দমে যায়নি, ভয় কাটিয়ে উঠেছে– এই আগ্রহের সময় যে কোনো তথ্য সহজে চুম্বকের মতো ধারণ করে নিতে পারে যে কোনো শিশু। ওবায়েদ মিয়া নিজের অজান্তেই শামুক এবং সাপ সম্পন্ধে বলে যাচ্ছিল, গোগ্রাসে যেন গিলেছে সুমিত। এ প্রক্রিয়ায় যে কোনো ধরনের সঞ্চিত জ্ঞান স্মৃতির পাতায় দৃঢ় ছাপ বসাতে পারে, ফলে সহজেই উবে যায় না তথ্য সমূহ, স্মৃতি শক্তি সজীব হতে বাধ্য।

তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন আগ্রহের সাথে অতি উদ্বিগ্নতা এবং ভয় মিশে না থাকে, ভয় থাকলে ধারণ গ্রহণ ক্ষমতা কমে যাবে।

দুষ্টুমি বুদ্ধিও শিশুদের মাথায় ঘুরপাক খেতে পারে, দেখতে হবে সেই দুষ্টুমি বিপজ্জনক কিনা, বিপজ্জনক হলে কৌশলেই তাকে জ্ঞান দিতে হবে, সরাসরি 'না' করা উচিত নয়, পরিস্থিতির সঠিক উপস্থাপনাই শিশুটির ভেতর ওই ধরনের আচরণের ব্যাপারে 'না বোধক' সিদ্ধান্ত জাগিয়ে তুলবে।

নিরাপদ দুষ্টুমি শিশুর মেধার বিকাশ ত্বরান্বিত করে।

রুহি মৌমাছি সম্বন্ধে অনেক তথ্য উপস্থাপন করেছে, এ সময় জানার প্রতি তার পূর্ণ মনোনিবেশ ছিল, আনন্দও ছিল ওতপ্রোত ভাবে। এইভাবে আনন্দও খেলাচ্ছলে অনেক তথ্য দিয়েই শিশুর জ্ঞান ভান্ডারকে পূর্ণ করা যায়।

সুমিত তার দুষ্টুমির খারাপ দিকটুকুর শিক্ষা পেয়েছে নিজের অতি ভয়ানক কর্মফলের কারণেই, ফলে এ পথে সে সহজে আর পা বাড়াবে না।

এভাবে একটি শিশুকে নিজের পরিবেশের ভেতর দিয়েই গড়ে তোলা যায়, মেধাবী হওয়ার পথও প্রশস্ত করা যায়।

কে রেখে যায় ফুলের পাপড়ি

টুম্পার মন খারাপ।

কেন খারাপ, জানে না সে।

এখন দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে, বাড়ির পিছন দিকে রয়েছে সুন্দর ফুলের বাগান, বাগানে অনেকগুলো লাল গোলাপ ফুটে আছে।

গোলাপ ফুল ওর খুব প্রিয়। তবে ফুল ছিঁড়ে না সে। হাতে ধরে, গন্ধ শোঁকে। ফুল দেখে মন ভালো হয়ে যায়।

পড়ার রুমে ঢোকে, পড়তে বসে। বই উল্টিয়ে তাজ্জব বনে যায় টুম্পা, বইয়ের ভিতর কয়েকটি তাজা লাল পাপড়ি।

কোত্থেকে এলো! গত দশ-পনেরো দিন তো সে বাগানে ঢুকেনি। তবে! মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে উঠলো।

তবে কি পাপড়িগুলো মামণি এনে রেখেছে?

এ ব্যাপারে মামণিকে জিজ্ঞাসা করা চলে না। কারণ মামণি ফুল কিংবা পাপড়ি ছেঁড়া একদম পছন্দ করে না।

ঘরে তো আর কেউ নেই। কে করতে পারে কাজটি!

হঠাৎ মরিচার কথা মনে হয়। মরিচা কাজের বুয়া।

'মরিচা! এই মরিচা!' চিৎকার দিয়ে বুয়াকে ডাকতে থাকে টুম্পা।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে মরিচা।

'আপামণি আমারে ডাকছেন?'

'এদিকে এসো। দেখো।' বইয়ের পাতা উল্টিয়ে দেখায় সে।

'দেখেছো?'

'দেখেছি।'

'কোত্থেকে এলো তাজা ফুলের পাপড়ি?'

'জানি না আপামণি।'

'জানো না?'

'না।'

'আমার ঘরে তো তুমি ছাড়া আর কেউ ঢোকে না, জানো?'

'আম্মা ঢুকে।'

'মামণি তো-ফুলের পাপড়ি ছেঁড়া পছন্দ করে না, জানো না?'

'জানি।'

'তবে! কোত্থেকে এলো!'

মরিচা ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দিলো না, ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'আমি যাই আপামণি।'

'টুম্পা ভুঁরু কুঁচকে মরিচার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

ক'দিন ধরে টুম্পা একদম চুপচাপ হয়ে আছে, একা একা ঘরে বসে থাকে, পড়ে না তেমন, গানও শোনে না, নিজের ভিতর যেন ডুবে আছে।

মামণি একটি রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী, বাপিও ব্যস্ত, ব্যবসা নিয়ে সারাদিন বাইরে থাকে।

মামণি-বাপির সান্নিধ্য সে কমই পায়।

এবার সেভেন থেকে এইটে উঠেছে, দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। ঋভু ওর বান্ধবী, প্রথম হয়েছে। পরীক্ষায় ঋভুর সাথে কম্পিটিশন হলেও, দু'জনার আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই।

একা একা ঋভুর কথা ভাবছিল টুম্পা।

হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, বুক সেলফের দিকে ছুটে যায়।

স্কুল বন্ধ হওয়ার দিন ঋভু একটি বই দিয়েছিল, বইটির নাম 'ভূতের নাম রমাকান্ত কামার।' গল্পের বই। পড়া হয়নি। হাতে নিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে টুম্পা।

এ সময় মরিচা এসে রুমে ঢুকে।

'আপামণি, আপনার দুধ খাওয়া হয়নি। আনবো?'

'একটু পর, এখন যাও।'

'আচ্ছা।' বলেই মরিচা হাঁটা দেয়।

মরিচার গমন পথের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে সে, মরিচার হাঁটার ভঙ্গিটা বড় অদ্ভুত!

বইটির প্রথম পাতা উল্টায় টুম্পা।

চোখ গোল গোল করে কতোক্ষণ বইয়ের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তারপরই তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে।

ঝরঝর করে কয়েকটি তাজা লাল গোলাপের পাপড়ি বইয়ের পাতা থেকে বিছানায় ছড়িয়ে পড়লো।

মুহূর্তের মধ্যে মাথাটি চক্কর দিয়ে উঠলো, একটু সহজ হয়ে ফুলের পাপড়ি গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। একদম তাজা, মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ পূর্বে কেউ রেখে গেছে বইয়ের ভিতর। কাঁচা গন্ধে ঘরটি যেন মৌ মৌ হয়ে উঠেছে।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে টুম্পা।

জানালা খোলা, দরজা খোলা। অল্প অল্প বাতাসে পর্দা উড়ছে। একবার জানালার দিকে তাকায়, একবার দরজার দিকে। হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ যেন ভয় পেলো। পরক্ষণেই ভয় কেটে যায়। স্বাভাবিক হয়। জানালার পাশে এসে পর্দা তুলে বাগানের দিকে তাকায়।

অদ্ভুত ব্যাপার!

বাগানের বাম কোণের আলাদা গোলাপের চারাটিতে একটি লাল গোলাপ দেখেছিল আজ সকালে, এখন দেখছে ফুলটির একটি অংশ ছেঁড়া, দু'একটি পাপড়ি নিচে পড়ে আছে।

নিশ্চয় মরিচার কাজ!

টুম্পা রেগে ওঠে ভিতরে ভিতরে, মরিচার ওপর ক্রোধ তার বেড়েই চলছে, রাগে কটমট করতে থাকে।

এ সময় মরিচা রুমে এসে ঢুকে।

'আপামণি, দুধ।'

মরিচার শব্দ শুনে তীব্র গতিতে ঘুরে দাঁড়ায় সে. রাগে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে

ওর রাগান্বিত মুখ দেখে ঘাবড়ে যায় মরিচা। দুধের গ্লাস টেবিলে রেখে প্লেট দিয়ে ঢেকে দেয়, কোনো শব্দ না করেই চুপচাপ ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

টুম্পা কিছুই বললো না, কেবল নিজের ভিতরের ক্রুদ্ধতা সামাল দিলো।

আগামীকাল ঋভুর জন্মদিন।

টুম্পা মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঋভুদের বাসায় যাবে, সব বান্ধবীরা আসবে, খুব মজার ব্যাপার।

কী গীফট করবে, ভেবে পেতে অসুবিধে হয় না।

ঋভু বই খুব পছন্দ করে, গীফট হিসাবে বই পেতে কিংবা দিতে দুটোই ঋভুর অতি পছন্দের ব্যাপার।

বেশ খুশি মন নিয়ে মামণির রুমে আসে টুম্পা, মামণি এখন বাসায়। আবদার করার এটাই উপযুক্ত সময়, সুযোগ বুঝে আবদার করতে হয়, যখন তখন আবদার করলে বিফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ভালোই বুঝে সে।

'মামণি, আজ একটু নিউমার্কেট যাবো।'

মা নিগার সুলতানা, মেয়ের আনন্দিত চোখ দেখে তৃপ্তি পেলেন।

নিশ্চিতভাবে বললেন, 'যেও।'

তুমি কি যাবে আমার সাথে মামণি ?'

'যাবো। কখন যেতে য়াও ?'

'সন্ধের পর।'

'আচ্ছা।'

টুম্পার নীরব মনটি ঝরঝরে হয়ে ওঠে। যদিও সব সময় একা একা থাকে, মামণিকে তেমন কাছে পায় না, তবুও বাপির চেয়ে মামণিই তার পছন্দের, কোনো কিছুর আবদার করলে আগে পিছে প্রশ্ন করেন'না, ইস্! বাপিটাও যদি এমন হতো!

নিজেদের গাড়ি নিয়ে মা-মেয়ে সন্ধের দিকে বের হয়েছে।

সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে ট্রাফিক জ্যাম, লালমাটিয়া থেকে এ পর্যন্ত এসে গাড়ি আর অগ্রসর হতে পারছে না।

নানা জাতের ভিক্ষুক ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ছে, প্রতিটি রিক্সা, ট্যাক্সি কিংবা গাড়ির জানালার পাশে হাত পাতছে তারা, মহা বিরক্তিকর ব্যাপার।

টুম্পার সবচেয়ে ভালো লাগলো একটি কিশোরী মেয়েকে। দশ/এগারো বছর বয়স, হাতে অসংখ্য বেলি ফুলের মালা। এক গাড়ি থেকে আর এক গাড়িতে ছুটোছুটি করছে।

টুম্পা ইশারায় ডাকে, ছুটে আসে মেয়েটি।

'লাগবো আপা, খুবই তাজা ফুল!'

'দুটো দাও।'

মেয়েটি তাড়াহুড়ো করে দুটো মালা এগিয়ে দেয়।

'কতো টাকা ?'

'আপনারে কওন লাগবো ?' মেয়েটির কণ্ঠে দ্রুততা, চপল উক্তি।

'বলো, শুনি।'

'কইলাম তো আপনার খুশি। তবে একটাতে পাঁচ টেহার কমে দিয়েন না যেন।'

টুম্পা কুড়ি টাকার একটি নোট বের করে।

'নাও, পুরোটিই তোমার।'

মেয়েটির মুখখানা মুহূর্তে আনন্দে চিকচিক করে ওঠে।

খুব ভালো লাগলো টুম্পার। মনে মনে ভাবে, ওরা কতো কষ্ট করে জীবন চালায়!

'কি নাম তোমার ?' জানতে চায় টুম্পা।

'শিশি।' হাসিমুখে জবাব দেয় মেয়েটি। তারপর দ্রুত অন্য গাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

'বাহ্! কি সুন্দর নাম!' এতোক্ষণে নিগার সুলতানা মুখ খোলেন। হাসি মুখে মেয়েটির চলে যাওয়া দেখেন।

নিউমার্কেটে ঢুকে সরাসরি বইয়ের দোকানের দিকে হাঁটা দেয় টুম্পা।

'তুমি কি বইয়ের দোকানে যাবে ?'

'জ্বি মামণি, বই কিনবো, আগামীকাল ঋভুর জন্মদিন, বই গীফট করবো ওকে।'

'বই উপহার দেওয়া ভালো। বান্ধবীর জন্মদিনে বই গীফট করছো দেখে খুশি হলাম।'

টুম্পাও খুশি হয়। বেশি ঘোরার প্রয়োজন হয় না। আগেই ঠিক করে রেখেছিল, দ্রুত কেনা হয়ে যায় পাঁচটি বই।

ওখানে দাঁড়িয়ে বইয়ের প্রথম পাতায় কিছু শুভেচ্ছাবাণী লিখলো, দোকান থেকেই সুন্দর মোড়কে বেঁধে নিলো বইগুলো, একটি প্যাকেটের মতো করে নিয়ে এলো বাসায়।

পরের দিনের ঘটনা।

টিভিতে মাত্র রাত দশটার সংবাদ শেষ হয়েছে। ঘুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে টুম্পা, রাত ন'টার দিকে সে এসেছে ঋভুদের বাসা থেকে, খুব মজা করেছে সবাই।

ঋভুকে যা সুন্দর লাগছিল!

ঋভুর কথা মনে হতেই মিষ্টি হাসি ফোটে ওর মুখে।

ক্রিং ! ক্রিং! ক্রিং! টেলিফোনটি হঠাৎ বেজে উঠলো।

সাধারণত টুম্পা ফোন রিসিভ করে না, আজ যে কি হলো! নিজেই তুললো রিসিভার।

হঠাৎ খুশির চমক লাগে তার চোখেমুখে।

'ঋভু বলছিস ?'

'হ্যাঁ, হ্যালো শুনেই বুঝে ফেলেছিস ?'

'বাহ্! তোর গলা বুঝবো না ?'

'শোন্, তোকে একটা ধন্যবাদ জানাতে ফোন করলাম।'

'আমাকে ধন্যবাদ জানাবি, কেন ?' টুম্পা আশ্চর্য হয়।

'তোর গীফটের সবাই প্রশংসা করলো।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ। তবে আমার ভালো লেগেছে 'বোতল ভূত' বইটির ভিতরে বেলি ফুলের পাপড়ি দেখে।'

'কি বললি ?'

'বললাম তো, বেলি ফুলের পাপড়ি! একটু মলিন হলেও দারুণ গন্ধ!'

এ প্রান্তে চুপচাপ।

'হ্যালো! হ্যালো! টুম্পা! এই টুম্পা! কথা বলছিস না কেন ? আরে! লাইন তো ঠিকই আছে। টুম্পা! টুম্পা!' ঋভুর কণ্ঠে অস্থিরতা।

আতঙ্কে টুম্পার হাত কাঁপতে থাকে, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে, তবে রিসিভার ছাড়েনি। মুখে শব্দ নেই, ফুল স্পীডে ফ্যান ঘুরছে, তবু ঘামতে শুরু করে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার বামপাশের দেয়ালের দিকে তাকায়, একটি ছোট্ট প্যারেকে গতকালের কেনা বেলিফুলের মালা দুটি ঝুলিয়ে রেখেছিল। একটি ঠিক আছে, অন্যটি ছেঁড়া। ছেঁড়া অংশ ঝুলে আছে, যেন হা করে টুম্পার দিকে তাকিয়ে আছে, রাক্ষুসি হা যেন এটি।

টুম্পা ভয় পায়, জড়োসড়ো হয়। অনেকক্ষণ পর বললো, 'পরে কথা বলবো ঋভু, এখন রাখি।'

ঋভু থতমত খেয়ে রিসিভার রেখে দেয়।

টুম্পা ধীরে ধীরে দেয়ালের দিকে যেতে থাকে, ছেঁড়া মালাটির ফাঁক দিয়ে হঠাৎ যেন শিশির মুখ ভেসে উঠলো।

চোখ গোল গোল করে সে মালাটির দিকে তাকায়। স্থির তাকিয়ে থাকে, শিশি হাসছে, যেন ডাকছে টুম্পাকে।

টুম্পা একবার মাত্র চিৎকার দিয়ে ডাকলো, 'মামণি!' চোখ বন্ধ করে দৌড়ে গিয়ে খাটে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

নিগার সুলতানা ছুটে আসেন, মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন।

অনেকক্ষণ পর সহজ হয় টুম্পা, ভয় কেটে যায়। মামণিকে সব খুলে বলে।

নিগার সুলতানা ভয় পেলেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কে করতে পারে এমন কাজ! কোনো জ্বীন-ভূতের ব্যাপার নয়তো!

শিক্ষিত হলে কি হবে, এ মুহূর্তে কুসংস্কার তাঁকেও পেয়ে বসেছে।

মরিচা পাশে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে দুধের গ্লাস, টেবিলে রাখে গ্লাসটি। আস্তে করে ডাকে, 'আম্মা! একটু এদিকে আহেন।'

নিগার সুলতানা ওঠেন। দরজার বাইরে মরিচা অপেক্ষা করছে, কিছুটা অস্থির সে।

'আম্মা! আমি জানি কে এ কাজ করে।'

'কে ? দেখেছিস ?'

'হ, দেখেছি। আপনারা যখন ঘরে না থাকেন, আপামণি যেন মাঝে মাঝে কেমন হইয়া যায়। মনে অয় যন্ত্রের মতো হাঁটে, চোখ বড় বড় করে এদিক ওদিক তাকায়, দুই হাত শরীরের লগে ঠাঁইসা রাখে। বাগানে যায়, ফুল ছিঁড়ে, নিজেই বইয়ের ভিত্‌রে রাখে। মনে অয় এ সময় আপামণির কোনো হুঁশ থাকে না, বেহুঁশে করে এমন কাজ।'

'বলিস কি ?'

'হ আম্মা! মিছা কমু ক্যা। ওই সময় কি করে কিচ্ছু খেয়াল থাকে না আপামণির। যখন হুঁশ হয়, চেঁচামেচি করে, আমারে দোষ দেয়।'

আঁতকে ওঠেন নিগার সুলতানা।

একা একা থাকতে থাকতে কি মেয়ে কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত হলো! অল্প সময়ের জন্য কেন তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাবে!

মেয়ের প্রতি কি মা-বাবা অবহেলা করেননি ? একাকীত্ব কি এ রোগ বয়ে আনে ?

নিগার সুলতানা দ্রুত ঘরে ঢোকেন।

টুম্পা দুধ খাচ্ছে, বেশ ভালোই আছে এখন। ভয় কেটে যায়, শান্তি পেলেন তিনি।

মনে মনে ঠিক করেন, আর মেয়েকে একা রাখা যাবে না। বাইরে সময় ব্যয় করার দরকার নেই, মেয়েকে নিয়েই থাকতে হবে, মেয়ের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি নজর রাখতে হবে। জড়িয়ে ধরেন তিনি টুম্পাকে।

অনেক দিন পরে যেন টুম্পা অন্য ধরনের আদর পেলো। খুশিতে ভরে উঠলো ওর মন।

পর্যালোচনা

আমরা দেখলাম টুম্পাকে, স্বল্পকালীন সময়ের জন্য কেবলই স্মৃতিশক্তিই হারায়নি সে, একটা পর্যায়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে নিজের অজান্তেই যেন নানা কান্ড ঘটিয়েছে। অন্যমনস্ক হয়েছে, বিক্ষিপ্তচিত্তে অসংলগ্নভাবে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরে বেরিয়েছে। যা ঘটেছে, কিছুই মনে করতে পারেনি। এ ধরনের ঘটনার সাথে নিজের সম্পৃক্ততার কথা জানে না, জিজ্ঞাস করলে অস্বীকারও করতে পারে। Dissocative fugue নামক ডিসওর্ডারে এমনটি ঘটতে পারে। বিষণ্নতা রোগ ইপিলেপ্সি'র কারণেও এমনটি হতে পারে।

সাধারণত নানা ধরনের দ্বন্দ্ব, মানসিক চাপ, বা তীব্র একাকীত্ব থেকেও Dissocative fugue হতে পারে, শৈশবে বাবা-মার সাথে জটিল সম্পর্কের কারণে এই বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

এমনি অবস্থায়, দ্রুত সনাক্ত করা না গেলে যে কোনো ভালো ছাত্র-ছাত্রীও ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে পারে মেধা ও মননের নানা ক্রিয়া কলাপ থেকে।

টুম্পার মায়ের উপলব্ধিই শেষ পর্যন্ত যথার্থ হয়েছে, গল্প হলেও এটি জীবনেরই অনুষঙ্গ, প্রেক্ষাপটের ভেতর দিয়েই উপস্থাপন করা হয়েছে— কারণ, উপসর্গ ও মায়ের করণীয় কাজটি যা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত।

বন্ধু আমার মা

সন্ধ্যা ঘনিভূত হচ্ছে।

জমকালো চাদর মুড়ে দিনের আলো ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

তানহা এখনো বাসায় ফেরেনি। বিকেলে বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলতে বের হয়েছে, সন্ধ্যার আগে ফেরার কথা, রোজই নিয়ম মতো ফিরে আসে, আজ ফিরছে না কেন!

তানহার মা তানজিনা অস্থির হয়ে পড়েছেন, উদ্বিগ্নতা বাড়ছেই তার, পায়চারি করছেন ঘরে বাইরে।

ছেলে বড় হচ্ছে, বেয়াড়াও হচ্ছে দিনে দিনে, কারো কথা শুনতে চায় না, ইচ্ছে মতো চলে, ইচ্ছে মতো আবদার করে। আবদার পূর্ণ না হলে ক্ষেপে যায়, বেসামাল হয়। এটা ওটা ছুঁড়ে মারে, তছনছ করে দেয় সাজানো গোছানো সংসারের প্রয়োজনীয় সব কিছু।

গাড়ির হর্ণ শুনে চমকে ওঠেন তানজিনা।

তানহার বাবা, ইফতেখার হোসেন, অতি ব্যস্ত লোক, রাত অনেক হয় বাড়ি ফিরতে। আজ এতো তাড়াতাড়ি! ব্যাপার কি ! সব ওলোটপালট ঘটছে কেন!

'সাবে খবর পাঠাইছে, আইজ বাসায় আইবো না, কাজে ব্যস্ত। ড্রাইভারে কইয়া গেল।' বাড়ির বুড়ো দারোয়ান আবদুল আজিজ এগিয়ে এসে বললো তানজিনাকে।

'যাক। না আসার খবর পাঠিয়েছে, চিন্তা করে অপেক্ষা করতে হবে না, স্বস্তি পাওয়া গেল।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো তানজিনা।

'মাজান, ছোট সাবতো এখনো আইলো না।' দারোয়ান আবারো বললো।

স্বস্তি উবে গেল আবার। মায়ের মন দুঃশ্চিন্তা প্রবণ। ছেলের অমঙ্গল চিন্তায় সব সময় আচ্ছন্ন থাকে, আচ্ছন্নতা কাটলো না তানজিনার।

'একটু দেখে এসো তো, খুঁজে দেখো চারদিক। মাঠের ওই দিকেও যেও।'

'আচ্ছা' বলেই আবদুল আজিজ বেরিয়ে যায়।

তানজিনা ক্রমশ দিশেহারা হচ্ছেন, ক্ষেপে যাচ্ছেন ছেলের ওপর। আসুক আজ, কিছু উত্তম মধ্যম না দিলে ছেলের শিক্ষা হবে না।

অনেকক্ষণ সময় পেরিয়ে গেছে, প্রতিটি মুহূর্তকে বড় লম্বা মনে হলো। বলা নেই, কওয়া নেই, এভাবে হঠাৎ অনিয়ম হলে, দেরি হলে মায়েরা তো কষ্ট পাবেই, ছেলেদের কি বুঝা উচিত নয়!

ওই তো তানহা, আবদুল আজিজের সাথে ফিরে আসছে। নাহ্! ভয়ের কিছু নেই, ছেলে সুস্থ আছে। মায়ের ভয় কেটে যায়, শান্তি জেগে ওঠে মনে। এতোক্ষণ বিষিয়ে ওঠা মনটি শান্ত হয়।

'এতো দেরি করলে কেন তানহা ?' মা জানতে চান।

'সব কথা কি তোমাকে বলতে হবে আম্মু ?' তানহা পাল্টা প্রশ্ন করে।

'বাহ্! বলবে না ? আমি তোমার মা। তুমি আমার একমাত্র ছেলে। কিছু জানতে চাইলে বলতে হবে না মাকে ?'

'না, বলতে হবে না। আমি বড় হচ্ছি না ? আমার কি ইচ্ছেমতো চলার অধিকার নেই?' মুখে মুখে জবাব দেয় তানহা।

'মাত্র ক্লাস সেভেনে পড়ছো তুমি। সেভেনে পড়া ছেলেকে কি বড় বলা যায় ? বড়দের কথা শুনতে হয়।'

'না! শুনতে পারবো না সব সময়।'

'না শুনলে ছেলেদের অমঙ্গল হয়।'

'হোক। যখন তখন খবরদারি করবে না।'

'তানহা রেগে যাচ্ছে, রেগে গেলে যে কি কাণ্ড করবে কে জানে, তানজিনা নিজেকে সামলালেন, নরম সুরে বললেন, 'সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা উচিত নয় তানহা। মায়েদের চিন্তা হয় ছেলেরা এ সময় বাহিরে কাটালে, মার কথা ভেবে আর দেরি করো না।'

মায়ের নরম সুর দেখে তানহাও নরম হয়। তবে কথায় এখনো একরোখা জেদ চেপে আছে।

'কথা দিতে পারবো না আম্মু। ইচ্ছে হলে তাড়াতাড়ি আসবো, ইচ্ছে হলে দেরিতে আসবো।'

'এ বয়সের ছেলেদের সবকিছু নিজের ইচ্ছে করা উচিত নয়।'

'কেন ? উচিত নয় কেন ?'

'উচিত নয়, কারণ তোমাদের বুদ্ধি এখনো কম। এ সময় ভুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। একবার ভুলের সাথে জড়িয়ে গেলে নিজেকে আর শোধরানোর সময় পাবে না।'

'তুমি কি তোমার ছেলেকে বোকা ভাবো ?'

'না তানহা। নিজের ছেলেকে কি কোনো মা বোকা ভাবতে পারে! মা সব সময় ছেলেকে বুদ্ধিমান ভাবে। ছেলের ভালো চায়, শুধু শুধু শাসন করতে চায় না।'

ভেতরে ভেতরে যুক্তিটি মানলো তানহা। তবে মায়ের অতিরিক্ত শাসন তাকে জেদী বানিয়েছে। জেদ নিয়েই বললো, 'আম্মু আমি কোনো অন্যায় করিনি। খেলা শেষে বন্ধুদের সাথে মাঠে বসে গল্প করছিলাম। তাই আসতে দেরি হয়েছে।' কথা শেষ করেই গটগট করে নিজের রুমে ঢুকে যায় তানহা। নিজের রুমটি আলাদা, অ্যাটাচড বাথরুম, পড়ার টেবিল, ডেক সেট, সব তার রুমেই আছে।

রুমের দরজা বন্ধ করে না কখনো, খোলা থাকে। পর্দা ঝুলে থাকে কেবল। আজ ঝট করেই দরজা বন্ধ করলো, খেলার ড্রেস পাল্টালো, বাথ রুমে ঢুকে হাত মুখ ধুলো, পরিচ্ছন্ন হয়ে পড়তে বসলো টেবিলে, কিন্তু পড়াতে মন বসছে না।

মায়ের অতিরিক্ত শাসন কিছুতেই মানতে পারছে না, সবকিছুতেই মায়ের দুশ্চিন্তা তার চলার পথ আগলে রাখে যেন রাতদিন।

টেবিল থেকে ওঠে তানহা, জানালার কাছে আসে। জানালা বন্ধ, খুলতেই চোখ জুড়িয়ে যায়, ঠাণ্ডা বাতাসের আলতো ছোঁয়া লাগে মুখে।

'ওহ! শান্তি!'

তানহার ভেতরের রাগরাগ ভাবটি কমে আসে। প্রাণ ভরে ঠাণ্ডা বাতাস টেনে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

সামনে ফুলের বাগান, বাগানে লাইট জ্বলছে, রজনী গন্ধার সৌরভ ভেসে আসছে, পুরো রুম জুড়ে মৌ মৌ গন্ধের শীতল পরশ।

'ওঃ! আম্মু! আম্মু!' একটি ভয়াবহ চিৎকার দেয় তানহা, হঠাৎ-ই। চিৎকার দিয়েই জানালা থেকে পেছনে ছিটকে আসে।

চিৎকার শুনেই তানজিনা ছুটে আসেন, দরজা বন্ধ, আতঙ্ক নিয়েই বন্ধ দরজা ধাক্কাতে থাকেন।

'তানহা! কি হয়েছে ? চিৎকার দিলে কেন ? দরজা খোলো, দরজা খোলো সোনা।'

মায়ের ডাক কানে ঢোকে, অল্প সময়ের মধ্যেই সে সহজ হয়ে ওঠে। দরজা খুলে দেয়।

ছুটে এসে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন তানজিনা।

'চিৎকার দিলে কেন আব্বু ?'

'ভয় পেয়েছিলাম। একটা জ্যান্ত টিকটিকি হঠাৎ উপর থেকে মাথায় পড়েছিল।'

'দেখেছ তুমি, টিকটিকিই তো ?'

'হ্যাঁ, টিকটিকিই।'

'টিকটিকি দেখে তো ভয়ের কিছু নেই। এই নিরীহ প্রাণীটি মানুষের ক্ষতি করে না।'

'তবুও ভয় পেলাম আম্মু।'

'আর ভয় পেয়ো না, ভয় পাওয়া ঠিক নয়। যে জিনিস মানুষের ক্ষতি করে না তা নিয়ে অযথা ভয় পাওয়া একটা ফ্যাশন। একটা রোগ, 'ফোবিয়া' আক্রান্ত মানুষেই কেবল নিরীহ প্রাণী, যেমন– টিকটিকি, তেলাপোকা দেখে ভয় পায়।'

'আচ্ছা আর ভয় পাবো না।'

'রাগ কমেছে তোমার ?'

তানহা জবাব দেয় না, লক্ষী ছেলের মতো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে।

'গলা শুকিয়ে গেছে, একটু আইসক্রীম খাবো।'

মা ছেলের মুখে আলতো করে আদর বুলিয়ে দেন। গলা ছাড়িয়ে যান ফ্রিজের কাছে, ফ্রিজ খুলেই একটু থমকালেন, আইসক্রীমের বক্সটি খালি।

তানহা আইসক্রীম খেতে খুব পছন্দ করে। ফ্রিজে আইসক্রীম থাকেই না, ফাঁকে ফুঁকে খেয়ে নেয়। ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটি না পেলে মাথা বিগড়ে যায়, ক্ষেপে ওঠে।

তানজিনা একটু শংকিত হলেন।

চট করে বুদ্ধি বের করেন, ঘরে ট্যাংগ আছে, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে নেন। শরবত এ মুহূর্তে ভাল লাগার কথা, আইসক্রীমের বিকল্প এখন আর কিছুই নেই।

শরবতের গ্লাস নিয়ে তানহার রুমে ফিরে এলেন তিনি।

'শরবত কেন ? আইসক্রীম কোথায় ?' কড়া স্বরে জানতে চায় তানহা।

'আইসক্রীম শেষ, এখন শরবত খাও, একটু পরেই আনিয়ে দিচ্ছি।'

'না থাক, শরবত খাবো না, পানিই খাবো।' গ্লাসটি এক হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়, দ্রুত আসে ফ্রিজের কাছে।

ঠাণ্ডা পানি বের করে একবোতল, গলগল করে খেয়ে নেয় অনেকটুকু পানি, খেতে গিয়ে বুক ভিজে যায়। তানজিনা বাধা দিতে পারলেন না

মাকে মোটেই পাত্তা দিচ্ছে না সে এখন। নিজ রুমে ফিরে আসে, ঝপ্ করে বিছানায় এলিয়ে দেয় শরীর।

'শার্ট বদলাও তানহা, শার্ট ভিজে গেছে।'

'পরে বদলাবো, তুমি যাও।'

'আমি বদলিয়ে দেই। ওঠো।'

'না করলাম না ? আমি কি শার্ট খুলতে পারি না ? বাড়াবাড়ি করো না আম্মু, বাড়াবাড়ি পছন্দ নয় আমার।'

'ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।'

'তুমি যাও তো। আমি বদলে নেবো।'

তানজিনা কথা বাড়ানোর সাহস পেলেন না, মন খারাপ করে ছেলের রুম থেকে বেরিয়ে এলেন।

ভেজা শার্ট গায়ে শুকিয়ে গেছে, বদলায়নি তানহা।

রাতে যখন খেতে এলো খুসখুস করে কাশি শুরু করলো। তানজিনা কিছুই বললো না, এক ধরনের অভিমানে আক্রান্ত হলেন।

ছেলে বেয়াড়া হচ্ছে, আদরের তোয়াক্কা করে না।

চুপচাপ দু'জনে খেলো। কথা বললো না কেউ।

তানহা ব্যাপারটি খেয়াল করলো, খাওয়ার সময় অন্যদিনের মতো আদর না পেয়ে আবারো ভেতরে ভেতরে জেদ চাপতে লাগলো।

মা অভিমান করতে পারে, রাগ করতে পারে, মারও যে রাগ ভাঙ্গানোর প্রয়োজন হতে পারে, এটি তার ধর্তব্যের মধ্যে নেই, অথচ থাকা উচিত ছিল।

চুপচাপ খেয়ে দু'জন দু'জনের রুমে চলে গেল।

রাত অনেক।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় তানহার।

কাশি বেড়েছে, গায়ে জ্বরও এসেছে, গলা ব্যথা করছে, মুখে লালা জমে গেছে।

উঠতে চাইলো, পুরোপুরি উঠলো না, মশারী তুলে একদলা থুথু ফেললো ফ্লোরে।

ছিঃ! কি বিশ্রী কাজটি করলো; উঠে বাথরুমে যাওয়া উচিত ছিল, যায়নি। চেষ্টা করেছিল উঠতে, পারেনি।

মনে মনে শংকিত হলো তানহা। মায়ের কথা শোনেনি, নিষেধ মানেনি। এ জন্যই কি জ্বর এলো!

বিছানায় ছটফট করছে। উহ্! আহ্! করছে কেবল।

মায়ের আদর পেতে ইচ্ছে করছে [illegible] রুমে যাওয়া উচিত, পারছে না যেতে।

এদিকে তানজিনাও ছটফট করছে, ঘুম আসছে না দু'চোখে।

দু'একবার কাশির শব্দ শুনেছেন।

চুপিচুপি ছেলের রুমের পাশে এলেন।

রুমে লাইট জ্বলছে। ঢুকেই অবাক হলেন, তানহার কষ্ট টের পেলেন। মান-অভিমানের কথা ভুলে গেলেন, দ্রুত গিয়ে ছেলের পাশে বসলেন, কপালে হাত রাখলেন। চমকে ওঠেন, হাত তুলে নেন দ্রুত। প্রচণ্ড জ্বর, হাত যেন পুড়ে যাচ্ছে। মমতাময়ী হাতের ছোঁয়ায় স্থির হয় তানহা, চোখ খুলে মাকে দেখে শান্তি পায়, এমন হাতের পরশই তো এখন কাম্য।

মাকে কাছে পেয়ে কষ্ট যেন অনেক কমে গেছে। উঠে বসতে চাইলো, পারলো না বসতে। কেবল ফ্যালফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তানজিনা দ্রুত যান বাথ রুমে, টাওয়েল ভিজিয়ে নেন, মাথায় জল-পট্টি দিতে শুরু করেন।

'আহ্! শান্তি! শান্তিতে যেন চোখ জুড়ে ঘুম এসে জড়ো হয়। ঘুমিয়ে পড়ে তানহা। মা শিয়রে বসে থাকেন।

সকাল ৮টার দিকে ঘুম ভাঙ্গে তানহার।

সকালের দিকে তানহার মামা, ডাঃ ফারুককে কল করে আনা হয়েছে। মামা বসে আছেন ভাগ্নের জন্য।

ঘুম ভেঙ্গেই মামাকে দেখে সে। খুশিতে চিকচিক করে ওঠে চোখ। মামা জ্বর দেখলেন, গলা পরীক্ষা করলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'টনসিলাইটিস।'

'কি বললে ?' নড়ে বসে প্রশ্ন করে তানহা।

'এটি রোগের নাম। গলা হলো খাদ্যনালীর প্রবেশদ্বার, গলার দু'পাশে দারোয়ানের মতো দুটো টনসিল ডিউটি করছে বসে বসে। খাওয়ার সময় কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করার সময় দারোয়ানের চোখ এড়াতে পারে না, গপ্ করে ধরে ফেলে, আমাদেরকে রোগশোক থেকে রক্ষা করে।'

'তাহলে ওরা তো আমাদের সেবক।'

'হ্যাঁ, সেবকই বটে। মানুষের উপকার করতে করতে এক সময় দারোয়ান দুটো অসুস্থ হয়ে পড়ে, নিজেরাই জীবাণুর আধারে পরিণত হয়। ঠাণ্ডা লাগলে ফুলে ওঠে, লাল হয়, ঢোক গিলতে ব্যথা লাগে, যেমন লাগছে তোমার।'

'মার মনে কষ্ট দিলে কি এমন হতে পারে ?'

'কেন ? মাকে কষ্ট দিয়েছ বুঝি ?'

'জানি না।'

'নারে বোকা, মায়েরা সন্তানের আচরণ সইতে পারে, কষ্ট পায় না। ঠাণ্ডা লাগলেই এ রোগ হতে পারে।'

'ওঃ।' তানহা আশ্বস্ত হয়। তবুও প্রশ্ন করে, 'ভালো হয়ে যাবো তো মামা?'

'অবশ্যই। ওষুধ খেলে কাল থেকেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে। তবে আইসক্রীম খেলে, ঠাণ্ডা পানি খেলে কিংবা গরম থেকে এসে ঘাম না শুকিয়ে গোসল করলে, ফ্যানের বাতাসের নীচে খালি গায়ে শুয়ে থাকলে আবার রোগটি দেখা দিতে পারে।'

'আবার! আবারো কষ্ট!' তানহা বিস্ময় নিয়ে জানতে চায়।

'হ্যাঁ, এটাই শেষ নয়। রোগটি বারবার হলে হৃৎপিণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, বাতজ্বর হতে পারে, প্রস্রাব তৈরির যন্ত্র কিডনিও অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।'

'ওরে বাবা!'

'হু ভাগ্নে! সাবধান, এখন থেকে তোমাকে আলাদা নিয়মনীতি মানতেই হবে, নইলে সারা জীবন কেবল রোগে শোকে মরবে।'

তানহার আর মামার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ঘাড় ঘুরিয়ে মায়ের দিকে তাকায়।

মা পাশে এসে বসেছেন, শংকিত মুখ।

মায়ের হাত মুঠি করে ধরে। এ হাত কতো আদরের হাত, কতো ভালোবাসার ছোঁয়া আছে এ হাতে, বোঝে তানহা।

মার কথা শোনেনি বলেই আজ এ দশা।

মার মতো ভালো বন্ধু কি আর আছে! নেই নেই।

মা ছেলের কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

তানহার চোখ উপচে পানি চলে আসে।

আস্তে আস্তে বলে, 'আম্মু তোমাকে আর কষ্ট দেবো না আমি।

মনে মনে বলে, 'আসল বন্ধু আমার আম্মুই। আম্মুর মতো কি আর বড় বন্ধু আছে এ জগতে!'

ব্যাখ্যা

এসএসসি কিংবা এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় কিছু গৌরবদীপ্ত ছবি আমরা দেখে থাকি।

গর্বিত মা-বাবার মাঝে বসে আছে মেধাবী সন্তান, অসাধারণ সুন্দর দৃশ্য। এমন একটি ছবি প্রতিটি মা-বাবার অবচেতন মনে নিশ্চয় লুকিয়ে থাকে।

গেল বছর রেজাল্ট প্রকাশিত হবার পর আলাদা আলাদাভাবে বিজয়ী মা-বাবার সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে। প্রত্যেক মা-ই বলেছেন সন্তানের সাথে তাদের নিবিড় বন্ধুত্বের কথা।

হ্যাঁ, সন্তানের সাথে মায়ের বন্ধুত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একটি সন্তানের নানা 'ফ্যাকালটি'তে লুকিয়ে থাকে নানা ধরনের দক্ষতা, মেধা। একটি সফল মা-ই মমতা আর বন্ধুত্বের ছোঁয়া দিয়ে নিজের অজান্তেই সেই গোপন ভান্ডারের ঢাকনাটি খুলে দিতে পারেন– ভালোমন্দের পথটি দেখিয়ে দিতে পারেন কৌশলে। সন্তান নিজ বিকাশের মাপ-কাঠিতে চড়েই পৌঁছে যাবে সাফল্যের চূড়ায়।

এখানে 'বন্ধুত্ব' এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, বন্ধুত্বের কারণেই সন্তানের মাঝে এক ধরনের প্রশান্তি বজায় থাকে, প্রশান্তির নীরব ছোঁয়াই তার কাজে জাগায় উদ্দীপনা, মনোসংযোগ থাকে দৃঢ়, স্মৃতির ভান্ডার হয় সমৃদ্ধ, বুদ্ধিদীপ্ত কর্মকাণ্ডের বিকাশ লাভ করে দ্রুত।

এক্ষেত্রে শাসনেরও প্রয়োজন আছে, তবে শাসনের উল্টো পিঠে থাকতে হবে আদর, মমতা, ভালোবাসা। শারীরিক শাস্তি গ্রহণযোগ্য নয়। শাস্তির প্রয়োজন হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে সন্তান যেন মায়ের ওপর কোনো বিষয়ে নির্ভরশীল হয়ে না ওঠে, তার নিজের গতিতেই সে এগিয়ে যাবে। প্রয়োজন 'সুন্দর পথটি'র দিক এবং লক্ষ্য দেখিয়ে দেওয়া। মা-বাবাই কেবল হতে পারে সন্তানের শ্রেষ্ঠ গাইড, বন্ধু।

এই গল্পের ভেতর রয়েছে একটি জেদী অথচ সুস্থ শিশুর নানা অনুষঙ্গ। ঘটনা প্রবাহের ভেতর দিয়ে তানহার মনে জাগিয়ে তোলা হয়েছে প্রকৃত উপলব্ধি 'মা-ই জগতে সবচেয়ে বড় বন্ধু'। এই উপলব্ধি উপদেশ দিয়ে তাকে শেখানো কঠিন। এমন পন্থা এবং কৌশল অবলম্বন করতে হবে যেন 'সঠিক কাজ' বা 'ভুল কাজ' সম্বন্ধে নিজের ভেতর চেতনা সৃষ্টি হয়। ভেতরগত এই চেতনাবোধই শিশুর সামাজিক, বুদ্ধিবিকাশের ধারাকে গতিশীল রাখে। সবশেষে বলা যেতে পারে, মায়ের সাথে সন্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণই একটি শিশুকে মেধাবী হতে অনেক দিক থেকেই সহায়তা করে। বুদ্ধিদীপ্ত জাতীর গড়ে তোলার জন্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।